হে বোন

কুরআন

তোমাকে যা বলেছে

সংকলন ও সংযোজন
ফারজানা আফরিন

হে বোন

কুরআন

তোমাকে যা বলেছে

ঐশীধর্ম ইসলামের দিকে যে কারণে সবচেয়ে বেশি আঙুল তোলা হয়—ইসলাম না কি পুরুষবাদী ধর্ম। ইসলাম পুরুষদের হাতে সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নারীদের করেছে ঘরবন্দি। রেখেছে আকণ্ঠ দমিয়ে। ওদিকে নারীবাদীদের দাবি—ঐশীগ্রন্থ খ্যাত কুরআনের অধিকাংশ হুকুমই না কি পুরুষদের অনুকূলে। যার ফলে দিনকে দিন মুসলিম নারীরা হচ্ছে নিগৃহীত, অধিকার বঞ্চিত এবং অবহেলিত।

অভিযোগগুলো যে একদমই ভিত্তিহীন তা কিন্তু নয়। কেননা, একদল স্বার্থান্বেষী পুরুষ ক্ষমতার অপব্যবহার করে সত্যি সত্যিই নারীদের দমিয়ে রাখতে চায়। করতে চায় কোণঠাসা।

এখন প্রশ্ন হলো, নারীদের ব্যাপারে আদতেই ইসলামের অবস্থান কী? কুরআনে কি আল্লাহ আসলেই নারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে বিধান জারি করেছেন? না কি উলটো তাদের করেছেন সুরক্ষিত? দিয়েছেন উঁচু মাকাম? নারী জাতির প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনে সেই ১৪শ' বছরে আগে আগমন ঘটেছিল যে ইসলামের, তার বিরুদ্ধে নারীদের নিগ্রহের অভিযোগ কতটা যৌক্তিক? পুরোটাই তবে পাগলের প্রলাপ?

আমাদের বোনদের জানতে ইচ্ছে করে—তার অধিকার নিয়ে ইসলাম কী বলে? সে অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত করলে তার শাস্তি কী হওয়া উচিত? যেখানে প্রথম ইসলাম-বরণকারী একজন নারী, সেই ইসলাম একজন নারীকে বঞ্চিত করবে—সেটা কীভাবে মানা যায়?

বোনেরা আরো জানতে চায়—তাদের জীবন-জ্যামিতি, চলা-ফেরা, আদব-আখলাক ইত্যাদি কেমন হওয়া উচিত? কেমনটা আল্লাহ পছন্দ করেন?

নারীবাদীরা যতই ফাঁকা বুলি আওড়াক, পশ্চিমা সংস্কৃতি যতই প্রাচুর্যের প্রলোভন দেখাক, আভিজাত্যের হাতছানি দিক—দিনশেষে আমার বোনেরা জান্নাত চায়। আল্লাহওয়ালি হওয়ার তামান্না লালন করে।

সে লক্ষ্যেই মাকতাবাতুল কলবের এবারের নিবেদন, "হে বোন কুরআন তোমাকে যা বলেছে...

অর্পণ

মহিয়সি আম্মা, প্রিয় আব্বুজান এবং সকল প্রিয়দের যারা আমার অনুপ্রেরণার উৎস।

সূচিপত্র

লেখিকার কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين

সকল প্রশংসা ও তারিফ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের পালনকর্তা। অসংখ্য দরুদ ও সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ এবং নবিকুলের শিরোমণি সরওয়ারে কায়েনাত, রাহমাতুল্লিল আলামিন, খাতামুন্নাবিইন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আহলে বায়াতের ওপর বর্ষিত হোক।

আলহামদুলিল্লাহ, নারীজাতের সমস্ত জড়বাদী কাটিয়ে নিষ্কলুষ এক চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতেই আমার এই পাণ্ডুলিপি সংকলনের অভিযাত্রা! কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না একজন ক্ষুদ্র লেখিকা ও আমার লেখা প্রথম পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কীভাবে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করব। দ্বীনে ফেরার পর থেকেই ইলম অর্জনে নিত্যনতুন বই সংগ্রহে ছিলাম উৎসুক। পাঠকমহলে নিজে কিছু উপস্থাপন করতে পারব, সত্যিই এটা ছিল কল্পনাতীত। লেখালিখির ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ার পরও কখনো সাহস হয়ে উঠিনি মলাটে কিছু আবদ্ধ করে পাঠকবৃন্দের উপকারে হস্তান্তর করব। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমায় কথামালার প্রাঞ্জল ও অনুপম উপস্থাপনার চেষ্টার তাওফিক দিলেন এবং সাথে ছিল অনেকের প্রাণঢালা অনুপ্রেরণা। রহমান তাদের মন বুঝে মনের মোয়ামেলা করুন, তাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা করুন, যারা আমার পথচলা ও সফলতার শিখরে পৌঁছাতে প্রতিটি মুহূর্ত অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমিন।

বর্তমান সমাজের নাজুক পরিস্থিতির কথা আমাদের কারোরই অজানা নয়। "নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার" এমন মুখরোচক হরেক বুলি আওড়িয়ে মুসলিম নারীদের ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলেছে। সমাজের অলিতে-গলিতে নারীবাদীর স্লোগান। যা নারীদের অশ্লীলতার প্রতি ধাপে ধাপে এগিয়ে নিচ্ছে। ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে পরিপূর্ণ রূপে গাফেল করে রাখছে।

সমাজের এহেন অবস্থায় "হে বোন, কুরআন তোমাকে যা বলেছে" বইটি অধ্যয়নে বিভিন্ন সংশয়ে পতিত সত্যান্বেষী , তাকওয়াবান, আদর্শ মুসলিমাহ হিসেবে গড়ে তুলবে বলে আশাবাদী ইন শা আল্লাহ।

বইটি আল কুরআন মাজীদ থেকে সংকলিত এবং সংযোজিত। যার অভ্যন্তরে রয়েছে নারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনের যাবতীয় বিধিবিধানসমূহ। পর্দা, বর্তমান সমাজের ফিতনা, বেপর্দার কুফল, ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা, ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর স্থান, নারী-পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য, নারীর ইদ্দত, তালাকপ্রাপ্তা নারীর ভরণপোষণ, নারীর মীরাস ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়গুলো আল কুরআনের আলোকে আলোচিত।

আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি ভাই-বোনকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন। যারা গাফেল আছেন তাদের সহিহ বুঝ দান করুন এবং প্রিয়দেরকে এই পাণ্ডুলিপি থেকে ইলম অর্জন করে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন। মানুষ হিসেবে আমরা কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নই। পাঠকমহলের নিকট আমার অনুরোধ ভুল-ত্রুটি থাকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তথ্যগত কোনো অসঙ্গতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই আমাদের অবগত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে সেটা সংশোধন করে নিব ইন শা আল্লাহ্। আপনাদের দুআয় আল্লাহ তায়ালার এই অবাধ্য দাসীকে রাখতে ভুলবেন না ইন শা আল্লাহ।

ফারজানা আফরিন

প্রকাশকের কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে যিনি এই পাপী বান্দাকে দ্বীনের খেদমত করার এই মহান কাজ করবার তাওফিক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

শুরুতেই বলে নিচ্ছি বইটি আমি কেন আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার ফিকির করলাম।

মুলত এই আধুনিক যুগে চারদিকে আধুনিকতার ছয়লাব, চলছে হরদম নারী অধিকার নিয়ে ফাঁকা বুলি, ভ্রান্ত বিশ্বাসে আকৃষ্ট করা হচ্ছে আমাদের ইসলামপ্রিয় মা-বোনদের।

ভ্রান্ত প্রগতিশীল দাবিদারগণ তাদেরকে কান পরা দিচ্ছে ইসলাম তাদেরকে কোনো অধিকারই দেয়নি। তারা বোঝাতে চাচ্ছে নারী-পুরুষের সমান অধিকার।

এই ভ্রান্ত প্রগতিশীলদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে আমাদের মা-বোনদের জন্য কত সুন্দর নীতিমালা, কত উচ্চ স্থানে তাদেরকে সম্মানিত করে স্থান দিয়ে রেখেছেন সেই বিষয়গুলো বাংলা ভাষাভাষী মা-বোনদের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা মনে করেই এই "হে বোন, কুরআন তোমাকে যা বলেছে" এর উদ্ভাবন।

আশা করি একটু হলেও আমাদের মা-বোনদের তাদের সম্মান, স্থান ও অধিকার সম্পর্কে ধারণা পাবে এই ছোট্ট বইটি পড়ে। উপকৃত হবেন অনেকেই ইন শা আল্লাহ।

পরিশেষে একটা কথাই বলব, আমরা মানুষরা ভুলের উর্ধ্বে নই; চেষ্টা করেছি আপনাদের হাতে সুন্দর কিছু তুলে দেওয়ার, তারপরও ভুল থেকে যেতেই পারে, আপনাদের চোখে কোনো ভুলের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানাবেন ইন শা আল্লাহ।

আর আমার জন্য দুআ করবেন যাতে আপনাদের জন্য কিছু উপকারী ইলম বই আকারে প্রকাশ করতে পারি।

প্রকাশক
এইচ এম মাজহার

ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর স্থান

ইসলামের আলো ফোটার আগে গোটা বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে নারীদের মর্যাদা ঘরের আর দশটা আসবাবের চেয়ে বেশি ছিল না। তখন চার পেয়ে পশুর মতো তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ের ব্যাপারেও তাদের মতামতের কোনো রকম মূল্য ছিল না। অভভিাবকরা যার দায়িত্বে তাদেরকে অর্পণ করত সেখানেই যেতে হতো। কোনো নারী তার আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মীরাসের অধিকারী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের মতন পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতো। নারীরা ছিল স্রেফ পুরুষদের ভোগ্যপণ্য। কোনো জিনিসেই তাদের স্বত্বাধিকারী ছিল না; আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে ধরা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার মতো এতটুকু অধিকারও তাদের ছিল না। তবে স্ত্রীরা চাইলে তাদের নারীত্বকে যেখানে খুশি, যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারত; এতে তাদের স্বামীরা বাধাও দিত না। তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে সভ্য দেশ হিসেবে ধরা হয়, সেগুলোতেও অনেকে এমনও ছিল, যারা নারীর মানব সত্তাকেই স্বীকার করত না।

ধর্মকর্মেও নারীদের জন্য কোনো অংশ ছিল না; তাদেরকে ইবাদত-উপাসনা কিংবা বেহেশতের যোগ্য মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোন কোন আইনসভায় পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল, এরা (নারীরা) হলো অপবিত্র এক জানোয়ার, যাতে আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই। সাধারণভাবে বাবার পক্ষে মেয়েকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়াকে কৌলীন্যের নিরিখ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউই হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনোটাই

আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। আবার, কোনো কোনো জাতির মধ্যে প্রথা ছিল, স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও তার চিতারোহণ করে মরতে হবে। ৫৮৬ সালে ফরাসিরা একটা প্রস্তাব পাশ করে। যেখানে তারা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল; নারীরা প্রাণী হিসেবে মানুষই বটে, কিন্তু তাদেরকে স্রেফ পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোট কথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলাম আসার আগে সৃষ্টির এ অংশটি ছিল ভীষণ অসহায়। তাদের ব্যাপারে বাস্তব কিংবা যুক্তিসঙ্গত কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না।

রাহমাতুল্লিল আলামীন ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্বাসীদের চোখের পর্দা উন্মোচন করেছে। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়নীতির প্রবর্তন করেছে; নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষন পুরুষের ওপর ফরয করেছে। বিয়ে-শাদি ও ধনসম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে। কোনো ব্যক্তি, তিনি বাবা হলেও, কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না; এমনকি তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির ওপর বিয়ে স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোনো পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যুর পর বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। তাদের সন্তুষ্টি বিধানকেও শরিয়তে মুহাম্মাদী ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে, অথবা তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।[১]

পূর্ববর্তী বিভিন্ন সভ্যতায় এবং ধর্মে নারীদেরকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করা হতো। এবার সেসবের কিছু নমুনা আমরা দেখব।

খ্রিষ্ট ধর্মের লোকেরা তো ধরেই নিয়েছিল যত অনিষ্টের মূল নারীই। যত দায়, যত দোষ সবই নারীর। এমনকি বিয়ের মতো পবিত্র বন্ধনকে তারা একটি গর্হিত কাজ ভেবে নিয়েছিল। একে পরিহার করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে ইংরেজদের সংবিধান

[১] তাফসিরে মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

স্ত্রীকে বেঁচে দেওয়ার অধিকারও স্বামীকে দিয়েছিল। এছাড়াও নিশিদিন নানানভাবে নারীদের ওপর অত্যাচার করা হতো। হিন্দু ধর্মে স্বামী মারা যাওয়ার পর বেঁচে থাকার অধিকারই ছিল না নারীর। স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় উঠে তাকে জীবন দিতে হতো। আর রোমক সভ্যতায় গৃহকর্তার হাতেই সবকিছু ছিল। নারীদের ঘরে-বাইরে, কোনো জায়গায়ই এতটুকুও অধিকার ছিল না। পরে রোমক সভ্যতা কিছুটা সভ্য হতে চাইলে তারা আইন করে নারীদের স্বত্ব প্রদান করল। নারী নিজে যা কামাই করবে তা তার নিজের এবং স্বামী মারা যাওয়ার পর তারা নিজেকে অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দিতে পারবে। আবার, ইহুদি ধর্মের লোকদের কাছে নারীরা ছিল অভিশপ্ত। তারা মনে করে, নারীর জন্যই আদম ধোঁকা খেয়েছিলেন, জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এমনকি হায়েযের সময় তারা নারীদের সাথে ওঠাবসা ও পানাহার বর্জন করে দিত। গ্রিক সভ্যতায় নারীরা আরো বেশি অত্যাচারিত ছিল। তাদের জীবন ছিল চার দেয়ালের মাঝে সীমাবদ্ধ। তাদেরকে সমাজের বোঝা, পরিবারের বোঝা, স্বামীর বোঝা মনে করা হতো। বানানো হতো তাদেরকে গণহারে ক্রীতদাসী। তাদেরকে পণ্যের মতো বেচা-কেনা হতো। নারীকে শুধু পুরুষের ভোগের বস্তু হিসেবেই ব্যবহার করা হতো। এভাবেই ইসলামবিরোধী প্রতিটি সভ্যতায় দিনের পর দিন নারীকে অজস্রভাবে অত্যাচার করা হতো।

ইসলামের আরশিতে নারীর মর্যাদা

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দুটি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। এর একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু মুদ্রার ওপিঠটির প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে, এ দুটি বস্তুই পৃথিবীতে শত হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম অনিষ্টের মূল কারণ। অন্যদিকে এ দুটো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং উৎকর্ষের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু যখনি এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখনি তা দুনিয়ার সবচাইতে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার রূপ ধারণ করে।

কুরআন মানুষকে একটা জীবন বিধান দিয়েছে। এতে উল্লিখিত দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফলাফল হতে পারে; দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে। সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার পদ্ধতি এবং সম্পদ বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা এসব একটা পৃথক বিষয় যাকে 'ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা' বলা যেতে পারে।

নারী সমাজ এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে এই আয়াতে বলা হয়েছে— নারীদের ওপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরি, তেমনিভাবে পুরুষদের ওপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য; তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে, পুরুষদের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশি।

প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার একটি আয়াতে আছে— যেহেতু আল্লাহ

একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তাই পুরুষেরা হলো নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল। এটা এজন্য যে, তারা তাদের জন্য নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।[১]

ঈমান-আমলের দিক দিয়ে নারী-পুরুষের উভয়ের মর্যাদা সমান। ঈমান-আমল যার যত বেশি তার মর্যাদাও তত বেশি। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বিভাজন করে প্রতিদান দেওয়া হবে না। আমলের প্রতিদানের দিক দিয়ে নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। কিন্তু নারীদের জন্য ভিন্ন কিছু কাজকর্ম আছে, যা স্রেফ তাদের জন্যই। আবার পুরুষদের জন্য এমন কিছু দিক রয়েছে, যা স্রেফ তাদের জন্যই। মোট কথা, নারী-পুরুষের পরিচয়ের পার্থক্যের জন্য দুজনের কাজকর্মের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য দিয়েছেন আল্লাহ। যা তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকেই মানানসই। কিন্তু বর্তমান সমাজে "নারী-পুরুষ সমান অধিকার" চেয়ে একটি স্লোগান শোনা যায়। আর এটি নিঃসন্দেহে বিধর্মীদের ষড়যন্ত্র। বিধর্মীরা নারীদের প্রায় বিবস্ত্র করে বাইরে বের করতে খুব সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করছে। সেই পরিকল্পনাকে মুখরোচক শিরোনাম বা স্লোগানে রূপ দিয়ে তারা তাদের নোংরা উদ্দেশ্যকে সফল করে চলেছে। যেমন, নারীদের পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের যে স্লোগান তারা বের করেছে এর মাধ্যমে নারীদের ঘর থেকে বের করে আনা হচ্ছে; তাদের খোলামেলা প্রদর্শন এবং অশ্লীল চলাফেরায় উৎসাহিত করছে। ফলে এতে করে সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে নানান রকম ফিতনা। কেননা নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সামান্য পার্থক্য আছে। সেক্ষেত্রে নারীরা ঘরে অবস্থানের জন্য পুরুষদের সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে। কারণ ঘরে অবস্থান করাই নারীদের জন্য শোভনীয়। সৃষ্টিকাল থেকেই আল্লাহ তায়ালা নারীকে দুর্বল ও কোমল করে সৃষ্টি করেছেন। নির্ধারণ করে দিয়েছেন—ঘরের জন্য নারী আর বাইরের জন্য পুরুষ। তাই যখনই নারীরা পুরুষদের মতো সমান অধিকার হাসিলের উদ্দেশ্যে বাইরে বিচরণ করবে তখনই সংসার জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হবে।

নারীদের জীবনে ৩টি পর্যায় রয়েছে; কন্যা, স্ত্রী এবং মা। প্রতিটি পর্যায়েই তাদেরকে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারিণী করা হয়েছে। প্রতিটি পর্যায়েই আল্লাহ

---

[১] তাফসিরে মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

তাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।

কম-বেশি অধিকাংশ মানুষই জানে, জাহেলি যুগে কোনো কন্যা জন্ম নেওয়া তাদের জন্য ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুঃসংবাদ। কন্যা জন্মগ্রহণ করার পর পিতা কীভাবে সমাজ থেকে মুখ লুকাবে এ জন্য একটা আশ্রয়স্থল খুঁজত। সেই অবমাননার জায়গা থেকে মহীয়ান আল্লাহ কন্যা সন্তানদেরকে করেছেন তাদের পিতামাতার জন্য সুসংবাদ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

> যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায়; প্রচণ্ড অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রাখে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে (কন্যাকে) থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুতে ফেলবে। শুনে রাখো, তাদের ফয়সালা খুবই জঘন্য।[১]

এই আয়াতে এটা স্পষ্ট, নিঃসন্দেহে কাফেররা ছিল নির্বোধ ও জঘন্য মন-মানসিকতার। মুশরিকদের দেওয়া অনেকগুলো অপবাদের মধ্যে একটি ছিল, তারা আল্লাহ তায়ালার জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করত। তারা বলত, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। অথচ তাদের এই নিকৃষ্ট অপবাদ থেকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র। মহীয়ান আল্লাহ বলেন,

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

> তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, আর তিনিও কারো থেকে জন্ম নেননি। তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউই নেই।[২]

তারা কত বড় নির্বোধ যে, আল্লাহ তায়ালার জন্য মেয়ে সন্তান বরাদ্দ করে, অথচ

[১] সূরা নাহল, আয়াত, ৫৮-৫৯
[২] সূরা ইখলাস, আয়াত, ৩-৪

নিজেদের জন্য ছেলে সন্তান বাগিয়ে নেয়। নিজেদের জন্য তাই স্থির করে যা ওরা চায়। মুশরিকদের অবস্থা এমন, যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় যে কন্যা সন্তান তারা আল্লাহর জন্য ভাগ করেছিল তখন বিষণ্ণতায় তাদের মুখ কালো হয়ে যায়।[১]

কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ অকল্যাণকর, তাদের জন্মগ্রহণ বিপদের লক্ষণ ইত্যাদি মনে করা মোটেও ঠিক নয়। কারণ, এটা মুশরিকদের কাজ। তাফসিরে "রুহুল বয়ানে" এসেছে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, যাতে অন্ধকার যুগের কুপ্রথার খণ্ডন হয়ে যায়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'যে লোক কন্যা সন্তানদের নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষার (বিপদের) সম্মুখীন হয়, তাহলে তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।'[২]

আরবের মুশরিকরা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদ শুনলে অসন্তুষ্ট হতো। প্রচণ্ড রাগের বশে তক্ষুনি ভূমিষ্ঠ শিশুকে জীবিত মাটিতে পুতে ফেলত। এ কারণেই নির্বোধগুলো কন্যা সন্তানকে আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্ধারিত করত; মেয়ে সন্তান হওয়ায় তারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হতো, মনের কষ্টে দগ্ধ হতো। আরবদের অভ্যাস ছিল, যখন কারো স্ত্রীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসত, তখন সে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেত। পরবর্তী সময়ে সেই নারীর স্বামী ছেলে সন্তান হওয়ার সংবাদ পেলে তুমুল আনন্দিত হয়ে স্ত্রীকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসত। আর যদি মেয়ে সন্তান হওয়ার খবর পেত, তাহলে আরও কিছুদিন স্ত্রীকে লুকিয়ে থাকতে বলত। সে সময় তার স্বামী মেয়ে সন্তানটিকে দুনিয়া ছাড়া করার ফন্দি খুঁজত। সেই অবস্থা তুলে ধরে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ، اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ

। তাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানির কারণে সে নিজ গোষ্ঠী ।

[১] তাফসিরে মাআরিফুল কুরআনের আলোকে
[২] বুখারি, হাদিস, ১৪১৮

> থেকে আত্মগোপন করে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুতে ফেলবে।[১]

ইতিহাস বলে, মুদার, তামিম এবং খুযাআহ গোত্রের লোকজন মেয়ে সন্তানকে জীবিত পুতে ফেলত। ইসলাম এসে জাহেলিয়াতের সেই নিকৃষ্ট প্রথা উচ্ছেদ করেছে। পুরো আরব অঞ্চলের জনগণের হৃদয়ে কন্যা সন্তানের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

> শুনে রাখো, তাদের ফয়সালা ভীষণ খারাপ।[২]

যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহর জন্যই মেয়ে সন্তান বরাদ্দ করা আর নিজেদের জন্য ছেলে সন্তান বরাদ্দ করা—একটি অমানবিক ও গর্হিত সিদ্ধান্ত। সে কথাই আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেছেন,

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى ، تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيْزٰى

> তাহলে কি তোমাদের জন্য ছেলে সন্তান আর আল্লাহর জন্য মেয়ে সন্তান? এটা তো ভারি অন্যায় ভাগাভাগি।[৩]

কত বড় আহাম্মকির কাজ, নিজেরা ছেলে নিবে, আর আল্লাহকে মেয়ে দিবে; আবার বিশ্বাস করবে, মেয়ে সন্তানের চেয়ে ছেলে সন্তান শ্রেষ্ঠ! মোট কথা, যে জিনিসটাকে তারা নিজেদের জন্য অপ্রিয় মনে করত, সেটাকে আল্লাহর ভাগে রেখে দিত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ

[১] সূরা নাহল, আয়াত, ৫৯
[২] সূরা নাহল, আয়াত, ৬০
[৩] সূরা নাজম, আয়াত, ২১-২২

| যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের উদাহরণ নিকৃষ্ট।[১] |

তাদের ছিল কন্যা সন্তানদের প্রতি চরম অনীহা; অন্যদিকে ছিল পুত্র সন্তানের প্রতি লোভাতুর মানসিকতা। এই বৈশিষ্ট্যের ফলে তারা এতটাই নির্দয় হয়ে উঠত, কন্যা সন্তানকে জীবিত মাটিতে পুতে ফেলতেও সংকোচবোধ করত না; অথচ আল্লাহ ছেলে দিক বা মেয়ে দিক, সব সন্তানই নিয়ামত।

وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰى

| এবং আল্লাহর জন্য রয়েছে মহান উদাহরণ।[২] |

মহীয়ান আল্লাহ স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততি থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি সকল প্রশংসনীয় বৈশিষ্টের অধিকারী। কোনো অপবিত্রতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

| তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৩] |

মোট কথা, কন্যা সন্তানকে খারাপ মনে করা জাহেলিয়াতের কুপ্রথা। এ থেকে মুসলমানদের বেঁচে থাকা উচিত; আল্লাহর ওয়াদায় আনন্দিত ও সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য।[৪]

সূরা নাহলের ৫৮-৫৯ নং আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসির

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের দুটি বদ অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। তারা নিজেদের ঘরে কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে এত নিকৃষ্ট মনে করত যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দিত না; চিন্তা করতে থাকত, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের কারণে তার যে মানহানি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না কি তাকে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে রেহাই পাবে। শুধু কি তাই, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্যই পছন্দ করত না, তাকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ যুক্ত করে বলত,

---

[১] সূরা নাহল, আয়াত, ৬০
[২] প্রাগুক্ত
[৩] প্রাগুক্ত
[৪] মাআরিফুল কুরআন, মুহাম্মাদ ইদরিস কান্ধলিভি রাহি.

ফেরেশতারা হলো আল্লাহ তায়ালার কন্যা। তাফসিরে বাহরে মুহীতে ইবনে আতিয়্যার বর্ণনায় এ বাক্যের মর্মে দুটি বদ অভ্যাসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমত, তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ, কন্যা সন্তান শাস্তি ও বেইজ্জতির কারণ। দ্বিতীয়ত, যে বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য বেইজ্জতি মনে করে, অথচ তাকে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্বন্ধ যুক্ত করে।[১]

উল্লিখিত আয়াত ও তাফসিরের মাধ্যমে এটা সুস্পস্ট, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে সুসংবাদ বলে ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে মুশরিকরা আকাট মূর্খ প্রমাণিত। কন্যা সন্তানকে আল্লাহ তায়ালা মা-বাবার জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে দান করেছেন। আল্লাহ যখন খুশি হন তখন দুনিয়াতে ৩টি জিনিস পাঠান। বৃষ্টি, মেহমান এবং কন্যা সন্তান। এই তিনটির মধ্যে কন্যা সন্তান তখনই দান করেন যখন আল্লাহ তায়ালা সেই মা-বাবার ওপর খুশি হন। এছাড়া কন্যা সন্তান যদি বাবা-মা হারায় এবং এরপর তাকে যে লালনপালন করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্যও রেখেছেন উত্তম প্রতিদান এবং সুসংবাদ।

যে ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে আল্লাহ তায়ালা সে ঘরে রহমত বর্ষণ করেন। ফেরেশতারা তাদের জন্য দোয়া করতে থাকে। হালের সময়ে এখনো এমন কিছু প্রচলিত স্থান রয়েছে, যারা জাহেলি যুগের লোকদের মতো কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণে নাখোশ হয়। অথচ, তারা ভালোভাবেই জানে কন্যা সন্তান কিংবা পুত্র সন্তান দুটোই আল্লাহ তায়ালার এখতিয়ারে। এছাড়া কন্যা সন্তান তার মা-বাবার জন্য জান্নাতি দাওয়াতনামা নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যা সন্তানের দেখাশোনাকারীর জন্য তিনটি পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন,

১। জাহান্নাম থেকে মুক্তি,
২। জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা,
৩। জান্নাতে নবিজির সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

। 'যে লোক কন্যা সন্তানদের নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, ।

[১] তাফসিরে মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

> তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।'[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

> 'যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনজন বোন আছে; সে তাদের সাথে খুব সুন্দর ব্যবহার করেছে, তাদেরকে নিজের জন্য অসম্মানের কারণ মনে করেনি, তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।'[২]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'যে ব্যক্তি দুজন কন্যা সন্তানকে লালনপালন করল (বিয়ের সময় হলে সুপাত্রের কাছে বিয়ে দিল) সে এবং আমি জান্নাতে এভাবে একসঙ্গে প্রবেশ করব (এ কথা বলার সময় নবিজি নিজের পাশাপাশি দুই আঙুল মিলিয়ে দেখালেন)।'[৩]

শুধু কন্যা সন্তান জন্ম দিলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে এমন নয়, বরং কন্যা সন্তান পৃথিবীতে সুসংবাদের বার্তা নিয়ে আসে। এখন এই কন্যা সন্তানকে এক আকাশ ভরা ভালোবাসা দিয়ে লালনপালন করে, দ্বিনি শিক্ষার পাঠ দিয়ে, সঠিক সময়ে সঠিক পাত্রের সাথে বিয়ে করিয়ে দিলে তবেই জান্নাত পাওয়ার খোশনসিব জুটবে।

প্রতিটি ভালো জিনিসের যত্ন নিলেই তা আরো ভালো কিছু অর্জনে সহায়তা করে। ঠিক তেমনি কন্যা সন্তানও। আল্লাহ তায়ালা কন্যা সন্তানকে যেভাবে দুনিয়াতে রহমত ও বরকতের চাঁদোয়া করে পাঠালেন ঠিক সেভাবে তাকেও অসীম যত্ন-স্নেহের সাথে তার রবকে চিনিয়ে দিতে হবে। তাকে আল্লাহ তায়ালার ঐশী বিধি অনুযায়ী লালনপালন করলেই সে জান্নাত পাওয়ার কারণ হতে পারে। অন্যথায় তাকে দুনিয়ার মাঝে নিজ মর্জিমতো ছেড়ে দিলে সেই আবার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বনে যাবে।

কন্যা সন্তানের প্রতি জাহেলি যুগের যে ধারণা ছিল আল্লাহ তায়ালা সেটাকে ভুল এবং নিকৃষ্ট প্রমাণ করে সূরা নাহলে আয়াত নাযিল করেন। কন্যা সন্তান হিসেবে

[১] তিরমিজি, হাদিস ১৯১৫
[২] বর্ণনাটি যঈফ বা দুর্বল।
[৩] তিরমিজি, হাদিস, ১৯১৪

নারীকে আল্লাহ তায়ালা সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। একইভাবে স্ত্রী হিসেবে নারীকে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে—তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। যারা চিন্তাভাবনা করে, তাদের জন্য এতে দিকনির্দেশনা রয়েছে।[১]

সংক্ষিপ্ত তাফসির

আলোচ্য আয়াত পুরুষ এবং নারীর দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য অন্তরের প্রশান্তিকে স্থির করেছে। এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন উভয়পক্ষ একে-অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা আদায় করে নেয়। নাহলে অধিকার আদায়ের বিশ্রী সংগ্রাম পারিবারিক শান্তি বরবাদ করে দিবে। এই অধিকার আদায়ের একটি উপায় ছিল আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা। যেমন, অন্যদের অধিকারের বেলায় তাই করা হয়েছে। মানে, একে-অপরের অধিকার হরণকে হারাম করে এর জন্য কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সাজা নির্ধারণ করা হয়েছে; ত্যাগ ও সহমর্মিতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস বলে, স্রেফ আইনের মাধ্যমে কোনো জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহভীতি যুক্ত করে দেওয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে বিধিবিধানের সাথে কুরআনের সর্বত্র اِتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا ভীতিবাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ অর্থাৎ, এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে। লক্ষণীয়, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি নিদর্শন এবং শেষভাগে একে অনেক নিদর্শন বলা হয়েছে; কারণ, আয়াতে বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক এবং তা থেকে অর্জিত

[১] সুরা রুম, আয়াত, ২১

পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারীতার দিক থেকে এটা এক নয়— বহু নিদর্শন।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

> তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ।[১]

সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার এখতিয়ারে। তিনি যাকে ইচ্ছে সম্মানের অধিকারী করেন, আবার যাকে ইচ্ছে লাঞ্ছিত করেন। মহাশক্তিধর আল্লাহ চাইলেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাকে মনিব-দাসীর মতন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা না করে এই বন্ধনকে বন্ধুসুলভ করেছেন। দুজনের ওপর দুজনেরই পরিপূর্ণ অধিকার দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীর মোহরানা স্বামীর জন্য ফরজে আইন করে দিয়েছেন। যদি কোনো পুরুষ স্ত্রীর মোহরানা আদায় না করে এবং স্ত্রীও তা মাফ না করে, তবে কিয়ামতের দিন ঐ স্বামীকে যিনাকারীর কাতারে দাঁড়াতে হবে। স্ত্রীর মোহরানা প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

> আর তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশিমনে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও। তারপর যদি তারা তা থেকে কিছু তোমাদের জন্য ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও।[২]

মোহরানা নিয়ে তৎকালীন আরবে কয়েক প্রকার জুলুম হতো:

এক. যে মেয়ের হক মোহরানা পাওয়া তাকে মোহরানা দেওয়া হতো না। বরং মেয়ের অভিভাবক স্বামী থেকে তা আদায় করে নিজে ভোগ করত। এটা নিতান্ত অন্যায় ছিল; মহা অন্যায়। এর প্রতিকারে কুরআন আদেশ দিয়েছে,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ

[১] সূরা বাকারা, আয়াত, ১৮৭

[২] সূরা নিসা, আয়াত, ৪

| তোমরা নারীদেরকে মোহরানা দাও।[১]

এ আয়াতে স্বামীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে মোহরানা প্রদান করে, অন্য কারো কাছে না দেয়। অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, মেয়ের মোহরানা যদি তাদের হস্তগত হয়, তবে মেয়েকে প্রদান করবে; তার অনুমতি ছাড়া তাতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।

দুই. কখনো যদি কাউকে মোহরানা দিতে হতো, তবে চরম বিরক্তির সাথে নাখোশ হয়ে জরিমানা মনে করে দিত। আলোচ্য আয়াত نِحْلَةً শব্দ দ্বারা এ জুলুমের প্রতিকার করা হয়েছে। কারণ, অভিধানে হৃষ্টচিত্তে কাউকে কিছু প্রদান করাকে نِحْلَةً বলে।

মোটকথা, এ আয়াতের শিক্ষা হলো, নারীদের মোহরানা একটি ওয়াজিব হক; তা পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। সকল ওয়াজিব হক যেভাবে হৃষ্টচিত্তে পরিশোধ করা জরুরি, মোহরানাও তেমনি একটি হক।

তিন. মোহরানার ব্যাপারে আরেকটি বড় অন্যায় ছিল; স্ত্রীকে দুর্বল ও নিরুপায় মনে করে অনেক স্বামী চাপ প্রয়োগ করে তাদের দ্বারা মোহরানা মাফ করিয়ে নিত। অথচ এভাবে মোহরানা মাফ হতো না, কিন্তু তারা মনে করত মাফ হয়ে গিয়েছে। এ অন্যায় বন্ধ করার জন্য কুরআনে এসেছে,

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

| তারপর যদি তারা তা থেকে কিছু তোমাদের জন্য ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও।[২]

সারকথা, জোরজবরদস্তি বা চাপ প্রয়োগ করে মোহরানা মাফ করিয়ে নেওয়া অর্থহীন। আদতে এর ফলে কিছুই মাফ হয় না। হ্যাঁ, যদি স্ত্রী খুশি হয়ে স্বেচ্ছায় মোহরানার কোনো অংশ মাফ করে দেয় কিংবা তা গ্রহণ করার পর ফিরিয়ে দেয়, তবে তা বৈধ।

জাহেলি যুগে এসব অন্যায় অনেক বেশি ছিল। কুরআনের আলোচ্য আয়াত দ্বারা

[১] প্রাগুক্ত
[২] প্রাগুক্ত

এ অন্যায়ের প্রতিকার করা হয়। আফসোসের বিষয় হলো, জাহেলি যুগের এই অন্যায়গুলো মুসলিমদের মাঝে আজও দেখা যায়। তাই এসব অন্যায় থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

স্ত্রীরা হৃষ্টচিত্তে মোহরানার কিছু অংশ প্রদান করলে কিংবা স্বামীদের থেকে তা গ্রহণই না করলে স্বামীরা তা ভোগ করতে পারবে— এর একটি বড় তাৎপর্য রয়েছে। শরিয়তের অন্যতম রীতি হলো, সানন্দে অনুমতি না দিলে কারো সামান্য সম্পদও অপর কারো জন্য হালাল নয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'সাবধান! জুলুম করো না। সাবধান! জুলুম করো না। সাবধান! জুলুম করো না। নিশ্চয়ই কারো সম্পদ অন্য কারো জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল নয়, যতক্ষণ না তা তার সন্তুষ্টিতে লাভ হয়।'[১]

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট, জাহেলি যুগের অত্যাচার থেকে আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকে তাদের অধিকার দিয়েছেন, মোহরানাবিধি জারি করেছেন। যতক্ষণ স্ত্রী এই মোহরানা সন্তুষ্টচিত্তে মাফ করে না দিবে, ততক্ষণ মোহরানা মাফ হবে না; উলটো মোহরানা পরিশোধ করতে হবে।

যাদের ধারণা, নারীদের সম্পদের অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাদের জানা উচিত— আল্লাহ তায়ালা নারীকে সর্বত্র সম্মানিত করেছেন। সম্পদের ক্ষেত্রে নারীকে বঞ্চিত করা হয়নি। উলটো তারা বেশি সম্পদ লাভ করে। একজন নারী তার বাবার সম্পদের হকদার, ছেলের সম্পদের হকদার, মায়ের সম্পদেরও হকদার। বিবাহের সময় মোহরানার হকদার, আবার স্বামীর সম্পদেরও হকদার। এমনকি স্বামীর অবর্তমানে তার রেখে যাওয়া সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশের হকদার সে। নিঃসন্দেহে, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম। কন্যা থেকে স্ত্রী, স্ত্রী থেকে মা হওয়ার এই প্রক্রিয়ায়, একজন নারীর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়। মাকে নিয়ে কবির ভাষায় বলা যায়,

"যেখানে দেখি যাহা,
মায়ের মতন আহা,

[১] মুসনাদে আহমাদ, ২০৬৯৫

একটি কথায় এত শুধা মেশা নাই।”

মা এমন এক মায়ার আঁচল, যার কাছে যেকোনো পরিস্থিতিতে গেলেও তা বিছানো থাকে সবসময়। মা এমন এক “ডাকবাক্স” যার কাছে হাজারো দুর্বলতা, দুঃখ, কষ্ট, অভিমান নিঃসংকোচে জমা রাখা যায়। অন্যত্র পোস্ট হওয়ার ভয় থাকে না। দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে যখন মায়ের কাছে হাজির হই, স্নেহ-মমতার ডালা সব সময় প্রস্তুত থাকে শান্ত্বনা দিতে। নতুন করে প্রশান্তি লাভ করা মায়ের ভালোবাসায় কোনো ভেজাল নেই, মলিনতা নেই, না আছে কোনো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন মায়েরা সব সময় নিজেদের সবটা বিলিয়ে দেয় বিনা সংকোচে। প্রতিটি মানুষের পৃথিবীতে আগমন এবং বেড়ে ওঠার পেছনে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মা। মায়ের তুলনা অন্য কারো সাথে চলে না। জগৎ সংসারের প্রতিটি মা সম্মানিতা।

একটা ঘটনা বলি। একদিন মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা আস সালামী রা. নবিজিকে বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি জিহাদ করতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে আপনার কী পরামর্শ?” জবাবে রাসুলুল্লাহ বললেন, “মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকো।” ইসলাম মায়ের মর্যাদাকে মহিমান্বিত করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

> আর আমি মানুষকে তার মা-বাবার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে নিরন্তর কষ্ট ভোগ করে পেটে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়াতে হয় দুবছরে। তাই, তুমি আমার এবং তোমার মা-বাবার শুকরিয়া আদায় করো। অবশেষে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।[১]

সংক্ষিপ্ত তাফসির

মা-বাবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং তাদেরকে মান্য করা ফরয। আল্লাহ তায়ালার আদেশ হলো, সন্তানের প্রতি পিতামাতাকে মান্য করতে হবে ও তাদের

[১] সূরা লুকমান, আয়াত, ১৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। পাশাপাশি নিজের (আল্লাহর প্রতি আনুগত্য) প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতামাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিরক এমন এক মারাত্মক অপরাধ, যা পিতামাতার নির্দেশে এমনকি বাধ্য করলেও জায়েজ হয়ে যায় না। যদি কারো পিতামাতা তাকে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনে বাধ্য করে, তবে এক্ষেত্রে পিতামাতার কথাও রক্ষা করা জায়েজ নয়।

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করার পাশাপাশি, এর অন্তর্নিহিত রহস্যও বর্ণনা করা হয়েছে। একজন মা, সন্তান জন্মদান এবং তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে অসামান্য ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট বরদাস্ত করেন। নয় মাস গর্ভে ধারণ করে সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। আবার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও দুবছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহাতে হয়। দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করার ফলে তার দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সন্তান লালনপালনের ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয়, সেজন্য শরিয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার আগে রাখা হয়েছে।

যদি পিতামাতা সন্তানকে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তবে এক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ হলো— তাদের কথা মানা যাবে না। কিন্তু মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হলো, সে সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতামাতার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ করে তাদেরকে অপমানিত করার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইসলাম হলো ন্যায়নীতির উজ্জ্বল প্রতীক। ইসলামে প্রত্যেক বস্তুর জন্যই একটি সীমা নির্ধারিত আছে। তাই অংশীদার স্থাপনের বেলায় পিতামাতার অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে আরেকটি হুকুমও প্রদান করা হয়েছে—

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

। দ্বীনের বিরুদ্ধে তাদের কথা মানবে না।[১] ।

কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম যথা শারীরিক সেবা যত্ন; সম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন

[১] সূরা লুকমান, আয়াত, ১৫

কার্পণ্য প্রদর্শিত না হয়। তাদের প্রতি বেয়াদবি ও অশালীনতা প্রদর্শন না করা হয়। তাদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দেওয়া যাবে না, যাতে অহেতুক মনঃবেদনার জন্ম হয়। মোটকথা, শিরক-কুফরির ক্ষেত্রে তাদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপারগতার কারণে বরদাস্ত করতে হবে। কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনঃকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।[১]

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করতে হবে, যদিও তারা কাফির হয়। তাদের প্রতিপালকের হকের শোকার আদায় করা ফরয ও ওয়াজিব।

সূরা নিসায় আল্লাহ তায়ালা পিতামাতার হক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা নিজের ইবাদতের পরপরই পিতামাতার হক সম্পর্কে বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নিয়ামত একান্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। কিন্তু বাহ্যিকভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, আল্লাহ তায়ালার পরে মানুষের প্রতি ইহসান বা অনুগ্রহ থাকে পিতামাতার। সাধারণ উপকরণসমূহের মধ্যে মানুষের অস্তিত্বের পেছনে পিতামাতাই বাহ্যিক কারণ। তাছাড়া, জন্ম থেকে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্ত কঠিন পথ ও স্তর রয়েছে, তাতে দেখা যায় পিতামাতাই তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখেন। তার প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের জামানতদার হয়ে থাকেন। সে জন্যই কুরআনের অন্যান্য জায়গায়ও পিতামাতার হকসমূহকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

। আমার এবং তোমার মা-বাবার শুকরিয়া আদায় করো।[২] ।

মাআয ইবনে জাবাল রা. বলেন, নবিজি দশটি অসিয়ত করেছিলেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য দুইটি হলো—

১। আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করবে না, যদি তোমাদেরকে সেজন্য হত্যা কিংবা অগ্নিদগ্ধও করা হয়, তবুও না।

২। নিজের পিতামাতার নাফরমানি কিংবা তাদের মনে কষ্ট দিবে না। যদি তারা

[১] মারেফুল কুরআনের আলোকে
[২] সূরা লুকমান, আয়াত, ১৪

এমন নির্দেশও দিয়ে দেন যে, তোমরা তোমাদের পরিবার ও ধনসম্পদ ত্যাগ করো।

নবিজির বাণীসমূহে যেমন পিতামাতার আনুগত্য ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাগিদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার সীমাহীন ফযিলত ও সওয়াবের কথাও উল্লেখ রয়েছে। তিরমিজি শরিফের এক রিওয়াতে বর্ণিত আছে— আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত। তেমনি আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি পিতামাতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত।

শোআবুল ঈমান গ্রন্থে বায়হাকি রাহি. এর রিওয়াতে বর্ণিত আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "যে পুত্র তার পিতামাতার অনুগত, সে যখনই নিজের পিতামাতার প্রতি সম্মান ও মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তখন সে একটি করে মকবুল হজের সওয়াব লাভ করে।"

বায়হাকির অন্য এক রিওয়াতে আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যে লোক পিতামাতার নাফরমানি করে এবং তাদের মনে কষ্ট দেয়, তাকে আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই বিভিন্ন বিপদাপদে ফেলা হয়।"[১]

ইসলামে একজন নারীর তিনটি স্তরের মর্যাদা সম্পর্কে এই দীর্ঘ আলোচনায় আমরা বুঝতে পেরেছি— ইসলাম নারীকে তার অধিকার থেকে কখনো বঞ্চিত করেনি, বরং ইসলাম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নারীরাও পুরুষের মতো বিশ্বাসী, সৎ জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার রাখে। নারী বলে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কারো সাথে তাকে জুড়ে দেওয়া হবে, এমন অধিকার কারো নেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিধবাই অধিক হকদার। এ ব্যাপারে অভিভাবকের কোনো কর্তৃত্ব নেই। কুমারীকে জিজ্ঞেস করে

[১] মারেফুল কুরআনের আলোকে

নিতে হবে। তার নীরবতাই হলো সম্মতি।”[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

> “কোনো বিধবা নারীকে তার অনুমতি ছাড়া এবং কোনো কুমারী নারীকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।’ সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, তার অনুমতি কী?’ নবিজি বললেন, ‘চুপ থাকা।’[২]

আল্লাহ তায়ালা নারীকে সর্বত্র সম্মানিত করেছেন, তার ন্যায্য অধিকার তাকে দিয়েছেন। ইসলামপূর্ব সমাজের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করেছেন। ইসলাম কোনোভাবেই নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি। বরং, ইসলাম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে।

[১] তিরমিজি, হাদিস, ১১০৮

[২] আবু দাউদ, হাদিস, ২০৯২

নারী স্বাধীনতা: বর্তমান ফিতনা-ফাসাদের নাটেরগুরু

নারীদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ছিল মস্ত বড় জুলুম, জঘন্য অন্যায় ও চরম নির্মমতা। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বল্গাহীন ছেড়ে দেওয়া, পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা এবং ভরণপোষণ ও জীবিকার দায়িত্ব তাদের হাতে ন্যস্ত করাও অধিকার হরণের শামিল। নারীর দৈহিক গঠন ও মানসিক অবস্থাও এসবের উপযোগী নয়। পারিবারিক কাজকর্ম এবং সন্তান লালনপালনের যে মহান দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবে তাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে— এটাই বরং তাদের জন্য উপযোগী।

তাছাড়া, পুরুষের আওতা, কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন স্ত্রীলোক মানবসমাজের জন্য ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়াবিবাদ এবং নানা রকম বিশৃঙ্খলা হতে বাধ্য। নিত্যদিনই এগুলো আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এ জন্য কুরআনুল কারীমে নারীদের ওয়াজিব হক বর্ণনার পাশাপাশি এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে,

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

| পুরুষের মর্যাদা নারীর চেয়ে এক স্তর ওপরে।[১] |

অন্যভাবে বলা যায়, পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক ও যিম্মাদার।

নারীদেরকে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্তুর মতো মনে করা ছিল ইসলামপূর্ব জাহেলি সমাজের একটি বড় ভুল। বর্তমান যুগে সেই ভুলের প্রতিকার করা হচ্ছে আরেকটি ভুলের মাধ্যমে। যার দরুন নারীদেরকে পুরুষের কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে

[১] সূরা বাকারা, আয়াত, ২২৮

মুক্ত করে দেওয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি সাধারণ ব্যাপার। সমগ্র বিশ্ব কলহ-বিবাদ ও ফিতনা-ফাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হালের খুন, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে রীতিমতো।

এমন এক সময় ছিল, যখন নারীকে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি মানুষ বলে গণ্য করতে রাজি ছিল না। নারীদের ওপর পুরুষদের যে কর্তৃত্ব তা নারী সমাজ এমনকি গোটা পৃথিবীর জন্য একান্ত কল্যাণকর। নারী স্বাধীনতার নামে আজ তারা সে কর্তৃত্ব একেবারে ধুয়ে-মুছে বিদায় করে দিয়েছে, যার অশুভ পরিণতি পৃথিবী নিত্যদিন প্রত্যক্ষ করছে। বলা বাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত কুরআনের আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফিতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। মানুষ আজ শান্তির খোঁজে নিত্যনতুন আইন প্রণয়ন করছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে। কিন্তু যে উৎস হতে ফিতনা-ফাসাদ ছড়াচ্ছে সেদিকে কারো ভ্রুক্ষেপই নেই।

আজ যদি ফিতনা-ফাসাদের কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য কোনো নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে দেখা যাবে নারীদের বেপরোয়া চালচলন পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি সামাজিক অশান্তির জন্য দায়ী। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রবৃত্তিপূজার প্রভাবে বড় বড় দার্শনিকের চোখও ধাঁধিয়ে গেছে। কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কোনো কল্যাণকর চিন্তাকে সহ্য করা হয় না।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করুন; নবিজির উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।[১]

হে বোন, কখনো কি ভেবেছো বর্তমান সমাজে অধিকার দাবি করতে গিয়ে নিজেদের ফিতনার মূল কারণ হিসেবে প্রদর্শন করছো না তো?

এখনকার সময়ে দেখা যায় চাকরিজীবী যুবকের তুলনায় চাকরিজীবি নারীর সংখ্যা বেশি। প্রতিটি কোম্পানি নিজেদের মার্কেটিংয়ের জন্য অধিক হারে নারীদের চাকরিতে নিয়োগ দিয়ে থাকে। প্রতিটি বিজ্ঞাপনে খোলামেলা সুন্দরী নারীরা থাকে তাদের মডেল।

[১] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

হে বোন, কখনো কি ভেবেছো এসব? নারীরা এতটাই সস্তা! কসমেটিকস্ থেকে শুরু করে শ্যাম্পুর প্যাকেট, খাবারের বিজ্ঞাপনসহ যে কোনো কোম্পানির বিজ্ঞাপনে তারা একজন অর্ধনগ্ন সুন্দরী রমণীকে প্রদর্শন করে। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই এদের দর্শন মিলে। আহা, যদি একবার বুঝতে বোন; কতটা সূক্ষ্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা নারীদের ব্যবহার করছে!

হে বোন, সময় থাকতে ফিরে এসো তোমার রবের দিকে। নিজেকে মুক্ত করো বিধর্মীদের এসব অশ্লীল পরিকল্পনা থেকে। তোমার রব তোমাকে তাওবা করার আরো একটি সুযোগ দিয়েছেন। বিফলে যেতে দিও না।

পুণ্যবতী স্ত্রীদের জন্য সুকথার সমাহার

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ، يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا

> হে নবি, আপনার স্ত্রীদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্য চাও, তবে আসো, আমি তোমাদেরকে কিছু ভোগ্য বস্তু দিয়ে উত্তমভাবে বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং পরকালীন নিবাস চাও, তবে তোমাদের মধ্য থেকে সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ অবশ্যই মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। হে নবি-পত্নীরা, তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করে বসলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।[১]

পুণ্যবতী স্ত্রীদের একটি অনিচ্ছাকৃত পদক্ষেপের কারণে নবিজির মনে এক প্রকার কষ্ট লাগে। তার প্রেক্ষিতে এ কথা বিবৃত হচ্ছে। এটি এই সূরার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঘটনাটা হলো, একবার নবিজির স্ত্রীরা সামান্য বাড়তি খোরপোশ আবদার করেছিলেন। এই আবদারে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন চাপ ছিল। কষ্ট দেওয়া তাদের ইচ্ছা না থাকলেও, পরোক্ষভাবে এতে নবিজি ব্যথিত হন। এ কারণে তিনি

[১] সূরা আহযাব, আয়াত, ২৮-৩০

স্ত্রীদের প্রতি নারাজ হন। ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়ার সঙ্গে এই কষ্টদানের একটি সাদৃশ্য তো ছিলই, তাই এখানে এই ঘটনার অবতারণা।

যেভাবে ঘটনাটির সূত্রপাত হয়

বনু কুরাইযা ও বনু নামির অভিযানের পর নবিজির স্ত্রীরা দেখলেন, লোকজন বেশ সচ্ছল। আর্থিকভাবে দেশের লোকজনের মাঝে অনেক সঙ্গতি বিরাজ করছে। তখন অন্যদের মতো তারাও একটু পরিতৃপ্ত জীবন উপভোগ করতে চাইলেন। একপর্যায়ে তারা এ প্রসঙ্গে নবিজির সঙ্গে কথা বললেন। ভালোবাসা ও ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে বাড়তি কিছু রুটিরুজি এবং জাগতিক ভোগ বিলাসের সামগ্রী আবদার করলেন। নবিজির কাছে বিষয়টি ভালো ঠেকল না। মনের মানুষদের পক্ষ থেকে এমন প্রচ্ছন্ন চাপে তিনি নাখোশ হলেন। বিবিদের জাগতিক এই আবদার যদিও প্রয়োজনীয় ও নিয়মের গণ্ডিতেই ছিল, তারপরও তা ছিল মানবিকপ্রসূত। তাদের হৃদয় সরোবরে নবিজির ভালোবাসা টইটম্বুল ছিল তাতে দ্বিধা নেই। এই আবদার করে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট দেওয়া তাদের আদৌ উদ্দেশ্য ছিল না। আবার আবদারকৃত সামগ্রী যে বিলাসবহুল জীবনের জন্য ছিল, তাও নয়। বরং অনেকটা প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের তাগিদেই ছিল।

নবিজি এসব এতটুকুও পছন্দ করলেন না। কসম খেয়ে বসলেন— মাসখানেক আর ঘরে ফিরবেন না। এরপর মসজিদের কাছাকাছি একটি দ্বিতল ভবনে অবস্থান নিলেন। এই ঘটনায় সাহাবিরা খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। বিশেষ করে আবু বকর এবং উমর রা.। উভয়েই নিজ নিজ মেয়েকে বকলেন, বোঝালেন এবং উপদেশ দিলেন— ফের যেন নবিজির কাছে কোনো কিছুর বায়না না ধরে। তারপর তারা নবিজির কাছে আসলেন এবং অনুনয়-বিনয় করে কথা বললেন। সাথে কিছু খোশগল্পও করলেন। এতে নবিজির মনের আচ্ছন্ন ভাব কেটে যায়, মনে পুলক জাগে।[১]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

[১] আরো বিস্তারিত জানতে তাফসিরে কুরতুবি, তাফসিরে ইবনে কাসির এবং তাফসিরে রুহুল মাআনি দেখুন।

> হে নবি, আপনার স্ত্রীদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্য চাও, তবে আসো, আমি তোমাদেরকে কিছু ভোগ্য বস্তু দিয়ে উত্তমভাবে বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং পরকালীন নিবাস চাও, তবে তোমাদের মধ্য থেকে সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ অবশ্যই মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।[১]

এই অবস্থায় এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সূরা আহযাবের আয়াতদ্বয় নাযিল হয়। যা 'অধিকার প্রদানের আয়াত' নামে খ্যাত। আয়াত দুটোতে নবিজির স্ত্রীদেরকে অধিকার দিয়ে দুটি পথের যেকোনো একটি বেছে নিতে বলা হয়েছিল। যদি তারা জাগতিক ভোগবিলাস গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়, তাহলে নবিজি যেন সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেন— তোমাদের সঙ্গে আমার বনিবনা হবে না। আসো আমি তোমাদেরকে (তালাকপ্রাপ্তা নারীকে প্রদেয়) যুগল কাপড় প্রদান করে সৌজন্যের সঙ্গে বিদায় করে দিই। পক্ষান্তরে যদি পরকাল, আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাহচর্য ও দরিদ্র্যপীড়িত জীবন তোমাদের পছন্দনীয় হয়, তাহলে তোমরা রাসুলের সঙ্গে থাকতে পারবে। তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রী দ্বিতীয় পথটি বেছে নিবে, তার জন্য আল্লাহর কাছে মহা প্রতিদান রয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য ছিল, যে সকল স্ত্রী নবিজির সঙ্গে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছে, তাদের মনমেজাজ জাগতিক শোভা-সৌন্দর্য থেকে মুক্ত হওয়া কাম্য। নবিজির জীবনসঙ্গিনী কেবল ওই নারীই হতে পারে, যার হৃদয়রাজ্যে নশ্বর দুনিয়ার ভালোবাসা ও আগ্রহের লেশমাত্রও নেই। কারণ, পার্থিব অনুরাগ সকল অনিষ্ট ও গুনাহের মূল। সুতরাং, নবি-সংসারে এমন কোনো সদস্য থাকতে পারে না, যার মনে জাগতিক ভালোবাসা ও অনুরাগের অবিচ্ছেদ্য অণু থাকে। কারণ, জাগতিক ভালোবাসা থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

এই সূরার শুরুর তিন রুকু পর্যন্ত মুনাফিকদের কষ্টদানের কথা উল্লেখ ছিল। তারপরের আয়াতে একনিষ্ঠ ও আন্তরিক লোকদের অনিচ্ছাকৃত কষ্টদানের বিবরণ রয়েছে। নবিজির স্ত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের আকাঙ্ক্ষায় যা কিছু চেয়েছিলেন— যদিও তা প্রয়োজন ও বৈধই ছিল, কিন্তু নবিজির মতো নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ব্যক্তির সাদা মনে আবিলতা সৃষ্টি করেছিল। এ জন্য নবি-পত্নীদেরকে

[১] সূরা আহযাব, আয়াত, ২৮-২৯

বোঝানোর জন্য আয়াত নাযিল হয়েছিল। যেখানে বলা হয়েছে, তাদের জন্য বৈধভাবে জাগতিক চিন্তাভাবনা করাও বৈধ নয়। পারলৌকিক কল্পনাকে সঞ্জীবন পানি মনে করা তাদের জন্য একান্ত কাম্য। পার্থিব চিন্তাচেতনা থেকে সৃষ্ট কলুষতা অপার্থিব চেতনাকে ফিকে করে দেয়। এই আয়াত নাযিল করার উদ্দেশ্য হলো, নবি-পত্নীগণের মনমেজাজকে পার্থিব শোভা-সৌন্দর্য ও আবেগ-অনুরাগ থেকে পরিচ্ছন্ন করা এবং দরিদ্র্যপীড়িত জীবনের ভালোবাসা দিয়ে সুরভিত করা।

যখন অধিকার প্রদানের এই আয়াতদ্বয় নাযিল হয়, তখন নবিজি সর্বাগ্রে আয়িশা রা. এর কাছে তা প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আয়িশা রা.-কে আয়াতগুলো শোনানোর আগে তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটি কথা বলব। উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়ো করে দিবে না। বরং তোমার বাবা-মার সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর উত্তর দিবে। আয়িশা রা. এর বর্ণনা মতে, নবিজি আমাকে আয়াত পড়ে শোনালেন। আমি কোনো প্রকার পরামর্শ ও দ্বিধাদ্বন্দ ছাড়াই আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং পরকাল বরণ করে নিলাম। এতে তাঁর মুখমণ্ডলে থাকা ক্লান্তির ছাপ উবে গেল। আনন্দের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল পুরো মুখজুড়ে। আয়িশা রা. বলেন— আমার পর বাকি স্ত্রীদেরকে কুরআনের এ আয়াত ও নির্দেশ শোনানো হলো। আমার মতন সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন। নবিজির সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের মোকাবিলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেউ গ্রহণ করলেন না। জাগতিক আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস সবাই মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন।

পর্দা নারীর আভিজাত্য

পর্দার আরবি শব্দ হিযাব। যার অর্থ ঘোমটা, আচ্ছাদন অথবা আবরণ। পর্দা এমন এক বিধান যা, নারী-পুরুষ সকলকে ইসলামি বিধানের আওতাভুক্ত হতে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে। যা অবলম্বন করা তাকওয়ার প্রথম দ্বার। পর্দা করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমাদের অন্যান্য আমলও মজবুত হয়। পর্দাকে আপন করে নিলে আমরা নিজেদের ঈমানী পরিচয়কে ধারণ করতে পারব। পর্দা প্রতিটি নারীর জন্য রক্ষাকবচ, সুরক্ষাদ্বার। পর্দার মাধ্যমে সৌন্দর্য হেফাজত করে তা আড়াল করা যায়। নারীর সৌন্দর্য অমূল্য সম্পদ। আর তা হেফাজত করার জন্যই রবের অনুগ্রহ এই পর্দার নিয়ামত। অন্তরে লুকিয়ে থাকা আল্লাহর ভয়, ঈমানের বহিঃপ্রকাশ হলো পর্দা।

পক্ষান্তরে, বর্তমান সমাজে পর্দাকে প্রগতির অন্তরায় বলে দাবি করা হয়। পর্দাকে মনে করা হয় সমাজের প্রতিটি কাজের প্রধান প্রতিবন্ধক। আমরা মনে করি, মেয়েদের উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে এবং যুগের সাথে তাল মেলাতে একমাত্র বাধা হচ্ছে পর্দা। অশালীন, নগ্ন, উশৃঙ্খল চলাফেরাকে আমরা স্বাধীনতা মনে করি। এই নগ্ন শহরে নিজেদের খোলামেলা প্রদর্শন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। কখনো নিজেদের প্রশ্ন করেছি— আমরা যেটাকে 'সেলফ ফ্রিডম' বা স্ব-স্বাধীনতা মনে করি আসলেই কি সেটা তা-ই যা আমরা ভাবছি? গভীরভাবে একবারও ভেবে দেখেছি, আমাদের এই নগ্ন চলাফেরায় ফায়দা কোথায়? হে বোন, বুঝতে শেখো! এখনো সময় আছে তোমার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করার।

সাধারণভাবে চিন্তা করলে দেখি, প্রতিটি জিনিসেরই ভালো ও মন্দ গুণাগুণ থাকে। সেসব গুণগুলোকে ঐ জিনিসের বৈশিষ্ট্য বলা হয়। তেমনিভাবে আল্লাহ

তায়ালা এবং নবিজির পক্ষ থেকেও নারীদের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেসব বৈশিষ্ট্য একজন নারীকে সাধারণ থেকে আদর্শ নারীতে পরিণত হতে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "পুরো দুনিয়াই হলো সম্পদ। আর দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।"[১]

উল্লিখিত হাদিসটি লক্ষ করলে অনেক কিছুই আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। প্রথমত, এখানে বলা হয়েছে, 'দুনিয়া হচ্ছে সম্পদ।' এই তিন শব্দের বাক্যটিতে যে কথাটা বলা হয়েছে তার গভীরতা পরিমাপ করার মতো মস্তিষ্ক আমাদের হয়নি। বাক্যটাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, পুরো দুনিয়াটাই সম্পদ। এখন ভেবে বলুন তো দুনিয়াতে কী নেই? যা আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান শুধু ততটুকুই তো আর দুনিয়া নয়। মাটির নিচে আছে কয়লার খনি, স্বর্ণের খনি, গ্যাসের খনি। এছাড়াও সাগরের তলদেশে আছে হীরা, মণি-মুক্তা ইত্যাদি মহামূল্যবান সম্পদ। এসব দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সবকিছু মিলিয়েই হচ্ছে দুনিয়া।

তারপর বলা হয়েছে, 'দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।' হে বোন, একবার কি ভেবে দেখেছো? নবিজি নিজে একথা বলেছেন। তোমাকে করেছেন সবথেকে সম্মানিত। এই দুনিয়ায় মহান রবের নিয়ামতের কোনো অভাব নেই। আমরা প্রতিটি মুহূর্তে নতুন নতুন জিনিস দেখে নতুনভাবে আশ্চর্য হই। এই বাক্যের মধ্যে থাকা সুসংবাদটি কিন্তু সবার জন্য নয়। এটা শুধুই সেসব নারীদের জন্য যারা নবিজির আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করে। আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

কুরআনেও আল্লাহ তায়ালা বিভিন্নভাবে নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। পর্দা সম্পর্কে সর্বপ্রথম আয়াত নাযিল হয় সূরা আহযাবে। মহীয়ান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

[১] নাসায়ি, হাদিস, ৩২৩২

> হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রী, মেয়ে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

আয়াতের ভাবার্থ: মুনাফিকরা দুভাবে নারী ও অন্যান্য মুসলিমদের উত্ত্যক্ত করত।

১। পথে চলাচলকারী নারীদেরকে উত্ত্যক্ত করত।
২। মিথ্যা গুজব বা অপবাদ ছড়াত।

পথে চলাচলকারী নারীদের উত্ত্যক্ত করা সমস্যাটি পর্দার বিধান আরোপের মাধ্যমে সমাধান হয়ে যায়। বর্তমানের মতো, কখন কী প্রোপাগান্ডা শুরু হয়ে যায়— এ নিয়ে লোকদের দুশ্চিন্তায় রাখতে মুনাফিকরা কৌশল অবলম্বন করত। অন্যদিকে শেষ পদ্ধতিতে উত্ত্যক্ত করার পথ বন্ধ করতে এই আয়াত নাযিল হয়— হে নবি, নিজের স্ত্রীদেরকে, মেয়েদেরকে এবং মুসলমান নারীদেরকে বলে দিন, প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তারা যেন তাদের ওপরে চাদরের কিছু অংশ টেনে নেয়। যাতে তাদের মাথা, চেহারা এবং শরীর কেউ দেখতে না পায়।

ইবনে আব্বাস রা. এর ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহ তায়ালা মুসলিম রমণীদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যখন কোনো প্রয়োজনে নিজেদের ঘর থেকে বের হবে, তখন যেন মাথা ও মুখমণ্ডল বড় চাদর দিয়ে ঢেকে নেয়। তবে একটি চোখ কোনোভাবে খোলা রাখতে পারে। যাতে পথ চলতে অসুবিধা না হয়। এভাবে মাথা, মুখমণ্ডল এবং শরীর ঢেকে নিলে তাদেরকে তাড়াতাড়ি চেনা যাবে। দেখেই বোঝা যাবে, তিনি সতী-স্বাধ্বী নারী, সচ্চরিত্র রমণী।" লোকজন পোশাক দেখে আচরণ করে। যার যেমন পোশাক, তার সাথে তেমন আচরণ করা হয়। কাজেই এমন বেশভূষা দেখলে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হবে না। দুর্বৃত্ত লোকজন তাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে না। বসন-ভূষণ দেখে কেউ তাদেরকে বিরক্ত করার সাহসই করবে না।

---

[১] সূরা আহযাব, আয়াত, ৫৯

দুষ্টু লোকেরা পথ চলতি নারীদেরকে উত্ত্যক্ত করে। আল্লাহ তায়ালা এই সমস্যারও সমাধান করে দিলেন। নারীরা তাদের ঘর থেকে বের হওয়ার সময় চাদর নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দিবে। তাদের মুখমণ্ডল ও আপাদমস্তক শরীর ঢেকে নিবে। যাতে লোকজন এ পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বুঝতে পারে, এই নারী অভিজাত, ভদ্র, আত্মমর্যাদাশীল এবং লাজুক। সাথে সাথে এ কথাও বুঝে নিবে, সে দাসী নয়। এ জন্য কেউ তাদের সাথে প্রয়োজনে দাসীর মতন আচরণ করবে না এবং কথা বলবে না। পর্দা দাসীর জন্যও প্রযোজ্য; তবে তার জন্য শিথিলতা রয়েছে। স্বাধীন নারীর মতো দাসীদের ক্ষেত্রে পর্দার ব্যাপারে ততটা কড়াকড়ি আরোপ করা হয়নি। যাতে সে সহজেই মালিকের সেবা করতে পারে।

উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নারীদের জন্য তাদের মুখমণ্ডল, চেহারা এবং আপাদমস্তক শরীর ঢেকে নেওয়া ফরয। কোনো পুরুষের জন্য তার চেহারা দেখা জায়েজ নেই। এমনকি সে নিজেও অন্যকে এ সুযোগ দিবে না। ইসলামের সূচনাকাল থেকে অদ্যবধি এই পর্দাপ্রথা মুসলিম সমাজে চালু আছে। যাকে খতম করার জন্য বর্তমানের প্রবৃত্তিপূজারিরা মরিয়া এবং এটাই তাদের একান্ত মনোবাসনা। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করুন। মুসলমানদেরকে এই ফিতনা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

যদি মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত রাখার ক্ষেত্রে অনিচ্ছায় কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান। তিনি এমন গুনাহ ও গাফিলতি মাফ করে দেন। মদিনার মুনাফিক ও দুষ্টু প্রকৃতির লোকজন নারীদেরকে পথেঘাটে চলতে-ফিরতে বিশেষত রাতের বেলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হলে উত্ত্যক্ত করত। পর্দায় আচ্ছাদিত থাকলে উত্ত্যক্ত করত না। বলত, এরা স্বাধীন নারী। এদেরকে বিরক্ত করো না। কিন্তু যথাযথ পর্দা না থাকলে দাসী ভেবে উত্ত্যক্ত করত। মুনাফিকদের আরেকটি দোষ ছিল। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ ও তথ্যাদি রটাত। উল্লিখিত আয়াতে প্রথম ফিতনা তথা স্বাধীন নারীদের উত্ত্যক্ত করার প্রতিবিধান করা হয়েছে।[১]

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা পর্দার ব্যাপারে অনেক বেশি উদাসীন। রাস্তাঘাটে, অলিতে-গলিতে, পার্কে, মার্কেটে কিংবা বাজারে যেকোনো জায়গায় আমরা

---

[১] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

নিজেদের খোলামেলা প্রদর্শন করতে সর্বদা ব্যস্ত থাকি। আমরা জানি, পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস আল্লাহ তায়ালা জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এসব প্রতিটি জোড়ার মাঝেই আছে অন্তর্নিহিত আকর্ষণ। প্রকৃতির ভারসাম্যের জন্য প্রত্যেক জোড়ার নিয়মতান্ত্রিক মিলন অপরিহার্য। কিন্তু মানুষ এক্ষেত্রে অন্য প্রাণী থেকে অনেকটাই ভিন্ন। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানুষের আকর্ষণ অন্য প্রাণীদের থেকে অনেক বেশি। এতটাই বেশি যা আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাবে নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরেও চলে যেতে পারে। আর এই আকর্ষণের অপব্যবহারের কারণে সামাজিক অবক্ষয় এবং বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমন বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তায়ালা পর্দার বিধান নাযিল করেছেন। আর যে নারীরা নিজেদের পর্দার মাঝে আবৃত রাখে তারা অধিকতর স্বাচ্ছন্দে কাজকর্মসমূহ সমাধা করতে পারে। পর্দার আওতাভুক্ত প্রতিটি নারী অনেক বেশি সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করে। তারা কখনো পুরুষদের দ্বারা অসম্মানিত হয় না। যেকোনো পরিবেশে তারা সম্মানিত। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় সম্মানিত করেন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ঈমানদার পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সংযত রাখে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। আল্লাহ জানেন যা তারা করে। আর ঈমানদার নারীদেরও বলে

দিন, তারাও যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং নিদেজের লজ্জাস্থান সংযত রাখে। যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না নিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, আপন নারীরা, নিজের মালিকানাধীন এমন পুরষ সেবক যাদের কোনো গরজ নেই এবং নারীদের গোপন বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে ঈমানদাররা, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।[১]

দৃষ্টি হেফাজত করার বিধান চারিত্রিক পবিত্রতার অনুপম রক্ষাকবচ। নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টি দেওয়া এবং পুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টি দেওয়া একটি মারাত্মক ফিতনা। কারণ, কারো চেহারা দেখলে তার রূপ-লাবণ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এতে স্বভাবত তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং প্রবৃত্তি তাকে কাছে পেতে চায়। এই আকর্ষণ পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিকে সক্রিয় চেষ্টা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্য আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের চোখ ও চোখের দৃষ্টি সম্পর্কিত বিধান ও শিষ্টাচার শেখানো হচ্ছে। যাতে এই ফিতনা থেকে মুক্ত থাকা যায়। এখানে পুরুষদের আগে দৃষ্টি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, পুরুষই নারীর প্রতি লালায়িত হয় ও কুনজর দেয়। বিপরীতে নারীদের মাঝে লাজুকতা বেশি। এ জন্য তাদের মাঝে কুনজরের প্রবণতা তুলনামূলক কম। তাই নারী ও পুরুষকে পৃথক পৃথকভাবে দৃষ্টি নত রাখতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে—হে নবি, ঈমানদারদের বলে দিন, তারা যদি নিজেদের ঈমানের নূর হেফাজত করতে চায়, তাহলে তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নিচু রাখে। অর্থাৎ, যেসব জিনিস দেখা বৈধ নয়, সেসবের দিকে যেন চোখ তুলেও না তাকায়। কাজেই যেসব জিনিস দেখা কোনোক্রমেই বৈধ নয়, তা সম্পূর্ণ না দেখা। আর যে জিনিস দেখা আদতে বৈধ; কিন্তু কাম ও যৌন উত্তেজনা নিয়ে দেখা বৈধ নয়, সেদিকে যৌনলিপ্সা নিয়ে দৃষ্টি না দেওয়া। কুনজর ও অন্যায় দৃষ্টি ব্যভিচারের সূচনা করে।

[১] সূরা নূর, আয়াত, ৩০-৩১

যদি আচমকা দৃষ্টি পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে। মোটকথা, দৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কোনো দৃষ্টি মাফ এবং কোনোটি একেবারেই হারাম।

মুমিনদের উচিত, তাদের লজ্জাস্থানেরও হেফাজত করা। অর্থাৎ, তারা যেন নিজেদের কাম ও যৌন লিপ্সা অবৈধ কাজে ব্যবহার না করে। এতে ব্যভিচার ও সমকামিতা সবই শামিল। এর আরেক অর্থ হতে পারে— সর্বদা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ও সতর ঢেকে রাখাও যে জরুরি সে কথাই বলা হয়েছে। একান্ত, নির্জন অবস্থায়ও নিজের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো নিষেধ। হাদিসে এসেছে, “নির্জন অবস্থায়ও নিজের লজ্জাস্থান দেখো না। কারণ, সে অবস্থায় কেউ না দেখলেও, আল্লাহ তায়ালা তো দেখেন। কাজেই তাঁর প্রতি লজ্জা ও শালীনতা প্রদর্শন করা উচিত।”

“চোখের দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানের হেফাজত মুমিনের জন্য শুদ্ধতর স্বভাব, যা তাদের ভেতর-বাহিরের নোংরামি থেকে পবিত্র রাখবে। এই পবিত্রতা মুমিন পুরুষকে মুশরিক পুরুষ থেকে এবং মুমিন নারীকে কাফের নারী থেকে পৃথক করে দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ এ সম্পর্কে জানেন যা তারা করে। আল্লাহ এ-ও জানেন, তোমাদের দৃষ্টি কোন দিকে এবং কী উদ্দেশ্যে উঠেছে।” প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা চোখের ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতে নিষিদ্ধ করেছেন লজ্জাস্থানের ব্যভিচারকে। এর কারণ হলো, বেগানা নারী দেখা এবং তার দিকে কুনজর দেওয়া— এটি ব্যভিচারের পূর্বাভাস ও পাপের ভূমিকা। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না।”[১] বেগানা নারীর দিকে তাকানো মানে ব্যভিচারের কাছে যাওয়া। এটি চোখের ব্যভিচার, যা লজ্জাস্থানের ব্যভিচারের প্রথম ধাপ। তারপর বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানেন। যেদিকেই দৃষ্টি ফেরাও না কেন, সেদিকে তোমাদের দৃষ্টি পড়ার আগেই তোমাদের ওপর আল্লাহর দৃষ্টি পৌঁছে যাবে। কাজেই তোমাদের ভয় করা উচিত। এসব কুদৃষ্টি পরিহার করা উচিত।

পরবর্তী আয়াতে নারীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তারাও যেন তাদের দৃষ্টি নত

[১] সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত, ৩২

রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে। এ প্রসঙ্গে নারীদের বাড়তি কিছু বিধানও বর্ণিত হয়েছে—হে নবি, আপনি ঈমানদার নারীদেরও বলে দিন, ঈমানের আবেদনে তোমাদের যদি নিজেদের চরিত্র রক্ষা করতে হয়, তবে পুরুষদের দৃষ্টি নিচু করা যথেষ্ট মনে করো না; বরং নারীদেরও উচিত, তারাও যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে। বেগানা পুরুষ দেখবে না এবং যা দেখতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, সেদিকে চোখ তুলেও তাকাবে না। চোখ তুলে বেগানা পুরুষের দিকে তাকানো শয়তানের বিষাক্ত তির। শয়তানের বক্তব্য হলো, “আমি নারী দিয়ে যে তির চালাই তা কখনো ব্যর্থ বা লক্ষ্যচ্যুত হয় না।” বুযুর্গদের মতে, “কুদৃষ্টি ব্যভিচারের পিয়ন ও পাপাচারীর দূত।”

আগের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। এখন নারীদের দৃষ্টি অবনত রাখতে নির্দেশ দিচ্ছেন— হে ঈমানদার নারীরা, তোমাদের উচিত নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখা। চাই সে পুরুষ তোমাদের দেখে কিংবা না-ই দেখে, তোমাদের সামনে যে পুরুষ রয়েছে, তাকে চেয়ে দেখো না, হোক সে অন্ধ; কারণ তোমরা তো অন্ধ নও। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ এবং তিরমিজিতে এসেছে, উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত; একদিন তিনি আর মাইমুনা রা. নবিজির কাছে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় একজন অন্ধ সাহাবী, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. আসলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, ‘তোমরা পর্দার আড়ালে চলে যাও।’ উম্মে সালামা বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইনি তো অন্ধ। আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না।’ জবাবে নবিজি বললেন, ‘তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাও না?’

এ হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, অন্ধ পুরুষের সাথেও পর্দা করা জরুরি। যদিও ফিতনার তেমন আশঙ্কা নেই। বিশেষত যখন স্বামীও ঘরে রয়েছে। মোটকথা, এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি অবনত রাখতে পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে উভয় পক্ষ থেকে ফিতনার ছিদ্রপথ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

ঈমানদার নারীরা যেন তাদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। তবে, যতটুকু সাজগোজ ও সৌন্দর্যের জিনিস সাধারণত খোলা থাকে, তা ঘরে প্রকাশ করা যাবে। অর্থাৎ, যতটুকু গোপন করা বা ঢেকে রাখা সাধারণত সম্ভব নয়; যেমন,

মুখমণ্ডল ও হাত। এগুলো সর্বক্ষণ ঢেকে রাখা অনেক কষ্টকর। মুখমণ্ডল খোলা না রাখলে নারীরা বাসা-বাড়িতে চলাফেরা করতে পারবে না। আর হাত খোলা ছাড়া বাড়ির কাজ কর্ম কীভাবে সম্পন্ন করবে? তো যে সৌন্দর্য ঢেকে রাখা সম্ভব নয়, তা খোলা রাখতে অসুবিধা নেই। আয়াতে সৌন্দর্য প্রকাশ ও প্রদর্শনকে যখন হারাম সাব্যস্ত করেছে, তখন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, এর বিপরীত সৌন্দর্য ঢেকে রাখা ফরয ও ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে।

নারীর গোটা শরীর পর্দার আওতাভুক্ত। নিজের ঘরেও তা ঢেকে রাখা ফরয ও অপরিহার্য। কিন্তু চেহারা ও দুহাত সর্বক্ষণ ঢেকে রাখা কষ্টকর। এ জন্য এসব অঙ্গ সতর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নিজের ঘরের ভেতর এসব অঙ্গ খোলা রাখা জায়েজ। জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা এসব অঙ্গ খোলা রাখতে বাধ্য করেছে। যদি ঢালাওভাবে এসব অঙ্গও ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হতো, তবে নারীদের প্রাত্যহিক কাজকর্মে অনেক জটিলতা দেখা দিত। এজন্য শরিয়ত এসব অঙ্গকে সতর থেকে বাদ দিয়েছে।

মুখমণ্ডল ও দুই হাত ছাড়া নারীর সমস্ত দেহ সতর, যা সর্বক্ষণ ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এর অর্থ এই নয় যে, নারী তার চেহারার সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য বেগানা পুরুষের সামনে খোলা রাখতে পারবে। বরং এটা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি পরপুরুষের জন্যও নারীর সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য দেখা ও তার প্রতি আসক্ত হওয়া নিষিদ্ধ। শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো নারীকে কোনো অঙ্গ খোলার অনুমতি দেওয়ার মানে এই নয় যে, পুরুষের জন্য তা দেখা জায়েজ। শরিয়ত এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; নারী-পুরুষকে এমন অশ্লীলতার অনুমোদন দিবে এবং নারী-পুরুষকে ব্যভিচারের চৌকাঠে পা রাখার অনুমতি দিবে।

আলোচিত আয়াতে যেসব মাহরাম পুরুষের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের ছাড়া অন্য কারো সামনে নারীর জন্য নিজের সৌন্দর্য তথা সৌন্দর্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। মাহরাম পুরুষের সামনে আসার ক্ষেত্রেও শর্ত রয়েছে, ফিতনার আশঙ্কা না থাকতে হবে। এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে আত্মীয়তার খাতিরে; কাম-প্রবৃত্তির জন্য নয়। কাম-প্রবৃত্তির সামান্য আভাস থাকলে মাহরাম পুরুষের সামনে আসাও নাজায়েজ।

নারীর জন্য বাড়ির ভেতরে অবস্থান করা কোন পর্যায়ে আবশ্যক, কোন কোন

অবস্থায় তার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া জায়েজ, যদি প্রয়োজনে বের হতে হয়, তবে কোন অবস্থায় বের হবে—তা সূরা আহ্যাবের ৩৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে, নারীর মুখমণ্ডল ও দুই হাত ছাড়া গোটা শরীর সতর। সবসময় সম্পূর্ণ দেহ ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এখন কথা হলো, নারী নিজের মুখমণ্ডল কোন পুরুষের সামনে খুলতে পারবে? "তারা যেন তাদের ওড়না নিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, আপন নারীরা, নিজের মালিকানাধীন এমন পুরষ সেবক যাদের কোনো গরজ নেই এবং নারীদের গোপন বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে ঈমানদাররা, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[১] অর্থাৎ, এ আয়াতে যে সকল পুরুষের কথা উল্লেখ রয়েছে, তারা ছাড়া আর কারো সামনে নারী তার মুখ খুলতে পারবে না।[২]

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـٰتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

> আর বৃদ্ধ নারীরা, যাদের বিয়ের আশা নেই, তাদর জন্য এতে কোনো গুনাহ নেই— যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের কিছু পোশাক খুলে রাখে। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।[৩]

এই সূরার শুরুতে নারীদের এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এ পর্যায়ে উক্ত আয়াতে বয়স্ক নারীদের সম্পর্কে বিধান

[১] সূরা নূর, আয়াত, ৩১
[২] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে
[৩] সূরা নূর, আয়াত, ৬০

বর্ণনা করা হয়েছে। বয়স্ক নারীদের ক্ষেত্রে তেমন পর্দা জরুরি নয়, যেমনটা জরুরি যুবতী নারীদের ক্ষেত্রে। যখন নারীর যৌবনকাল অতিবাহিত হয়ে যায় এবং বার্ধক্যের এমন স্তরে উপনীত হয় যে, বিবাহের প্রয়োজনই ফুরিয়ে গেছে— এমন অবস্থায় সে যদি নিজের বাসা-বাড়িতে স্বল্প কাপড় দিয়ে পর্দা করে থাকে, তাও দুরস্ত। তবে তখনো পূর্ণ পর্দা করা উত্তম।[১]

পর্দা প্রতিটি নারীর জন্য ফরয বিধান। পর্দা নারীর সৌন্দর্য। পর্দা নারীর আভিজাত্য, পর্দা নারীর আদর্শিক পরিচয়ের বাহক। পর্দা নারীর ঈমানি শক্তির পরিচয় বহন করে। প্রতিটি নারীর জন্য পর্দাবিধান পরিপূর্ণভাবে পালন করা আবশ্যক। এটা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ।

[১] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

সৌন্দর্যের পাঠ

'যিনত' অর্থ শোভা, সৌন্দর্য, সাজসজ্জা প্রভৃতি। এটা কুদরতি ও সৃষ্টিগত হতে পারে। যেমন, মুখমণ্ডল, দুই হাত এবং দুই পায়ের পাতা। আবার কৃত্রিম ও ঐচ্ছিকও হতে পারে। যেমন, পোশাক ও অলংকার। উভয় প্রকার সৌন্দর্যকে বলে বাহ্যিক সৌন্দর্য, যা আয়াতে 'তবে যা প্রকাশমান' বলে বোঝানো হয়েছে। এসব সৌন্দর্য মাহ্‌রাম পুরুষ ছাড়া অন্য কারো সামনে প্রকাশ করা জায়েজ নয়। মাহ্‌রাম পুরুষের বর্ণনা আলোচ্য আয়াতে রয়েছে।

ব্যভিচারের রাস্তা বন্ধ করার তৃতীয় উপায় হলো— ঈমানদার নারীরা যেন তাদের বুকের ওপর ওড়না ফেলে রাখে। যাতে তাদের মাথা, ঘাড় এবং বুক ঢেকে থাকে। বুকের সৌন্দর্য যেন কারো কাছে প্রকাশ না পায়। জাহেলি যুগের রীতি ছিল, সে সময়ের নারীরা বুক উন্মুক্ত রেখে, ঘাড় ও চুল বের করে চলাফেরা করত। উদাম বুকে পুরুষদের সামনে যাতায়াত করত। আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানদার নারীদের বুক ও ঘাড় ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, "হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রী, মেয়ে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না।"[১]

বেপর্দার কুফল

বেপর্দার কুফলগুলো হলো—

১. বেপর্দায় থাকার কারণে আত্মমর্যাদা বিলিন হয়।

২. ব্যভিচারের দুয়ার খুলে যায়।

[১] সূরা আহযাব, আয়াত, ৫৯

৩. অবৈধ সন্তান জন্ম নেয়।

৪. বংশ ও কৌলীন্য নষ্ট হয়।

৫. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়।

৬. বেপর্দা স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানের ব্যাপারে, নিজের ঔরসজাত সন্তান কি না তাতে পিতা শতভাগ নিশ্চিত নয়।

৭. উত্তরাধিকারের অনুপযুক্ত ওয়ারিশ।

৮. বেপর্দা স্ত্রী স্বামীকে মানসিকভাবে প্রশান্তি দিতে পারে না। স্বামী ঘরে ফিরে স্ত্রীকে অনুপস্থিত দেখে। এতে নানা জল্পনাকল্পনা তার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। ফলে দাম্পত্য জীবনের শান্তি ব্যাহত হয়।

৯. বেপর্দা স্ত্রী স্বামীর খেদমত করতে পারে না; তার আনুগত্য করতে পারে না।

১০. বেপর্দা নারী সন্তানের লালনপালন যথাযথভাবে করতে পারে না।

১১. বেপর্দা থাকার কারণে বৈবাহিক সম্পর্কে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক বিরোধ থেকে পরিস্থিতির অবনতি হয়।

১২. বেপর্দা একজন নারীকে উশৃঙ্খল জীবনযাপনের দিকে নিয়ে যায়। ফলে বেপর্দা নারী বিভিন্ন অজুহাত ও মিথ্যার আশ্রয় নেয়। ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য ছলচাতুরি করে।

১৩. মায়ের দেখাদেখি সন্তানও বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে।

১৪. বেপর্দার মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে বেহায়াপনাও বাড়তে থাকে এবং আত্মমর্যাদায় ভাটা পড়ে। এতে সমাজে খারাপ প্রভাব পড়ে।

১৫. বেপর্দার সুদূরপ্রসারী কুফল হলো, ধীরে ধীরে পরিবার থেকে হায়া, শরম, নৈতিক শুচিতা এবং আত্মমর্যাদা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ হয়ে যায়।

পর্দা বিরোধীদের খোঁড়া যুক্তি

তারা বলে— নারী-পুরুষের স্বভাব এক ও অভিন্ন। সুতরাং, পুরুষ যদি অবাধে চলতে পারে, নারী কেন পারবে না? তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। লিঙ্গ বৈষম্য নিরসন করে সমতা বিধান করা চাই। নারী-পুরুষ সমান। তাদের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই।

অথচ, নারী পুরুষের স্বভাব-প্রকৃতি কখনোই এক-অভিন্ন নয়। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি, মেধা-বুদ্ধি এবং প্রতিভায় নারী কখনোই পুরুষের সমান নয়। বরং, এসব বিবেচনায় নারী-পুরুষের মাঝে আকাশ-জমিন ফারাক। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনীসহ বিভিন্ন সৈন্যদলে নারীর কম উপস্থিতি এই বাস্তবতারই সাক্ষ্য প্রদান করে। কোনো দেশের সরকারই শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে গঠিত সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে সাধারণত কোনো নারীকে মনোনীত করে না। যারা প্রগতিবাদী, তারাও শত্রুবাহিনীর সাথে লড়াইয়ের জন্য সীমান্ত এলাকায় নারী সৈনিকদেরকে পাঠায় না। সমতার দাবিতে এতই আন্তরিক হলে, তাদের উচিত আগে এসব কাজে হাত দেওয়া।

পর্দা নারীর জন্য অবরোধ ও বন্দিদশা

পর্দা নারীর জন্য অবরোধ নয়। এটি তার সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা রক্ষার দুর্ভেদ্য দুর্গ। অপবিত্র ও নোংরা কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ। একজন পর্দানশিন নারী যতটা নিরাপদ এবং শ্রদ্ধার উপযুক্ত, বেপর্দা নারী তার ধারে কাছেও নেই। পর্দা নারীকে সর্বাবস্থায় সম্মানিত করে। পর্দা নারীর জন্য আসমান থেকে প্রেরিত এক অমূল্য বিধান।

পর্দা নারীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

পর্দা নারীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং, নারীর স্বভাব ও প্রকৃতি বান্ধব। প্রকৃতিগতভাবে নারীর শারীরিক শক্তি কম। তারা পুরুষের মতো পরিশ্রম করতে পারে না। পথেঘাটে কাজ করতে পারে না। আর না পারে সামরিক কাজে অংশগ্রহণ করতে। তাদের এই শারীরিক দুর্বলতার কারণেই পর্দার বিধান জারি হয়েছে। যদি ধরেও নেওয়া হয়, পর্দা নারীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে বলব, পর্দাহীনতা নারীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যের জন্য হাজার গুণ বেশি ক্ষতিকর। বেপর্দা তাকে নানা ধরনের নৈতিক রোগব্যাধিতে আক্রান্ত করে এবং তার হায়া-শরমের আবরণ খুলে দেয়।

পর্দা না কি নারীর প্রগতির অন্তরায়! এর কারণে নারীরা শিক্ষা ও জাগতিক ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারে না। অথচ হাদিসে প্রত্যেক নর-নারীর জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রগতিবাদীরা জ্ঞান অন্বেষণ বলতে স্কুল-কলেজে পড়া জাগতিক জ্ঞানকে বোঝে। সেখানে ছেলে-মেয়েদের সহশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। অথচ ইসলাম জাগতিক জ্ঞান হাসিল করা এবং পার্থিব বিদ্যা অন্বেষণ করাকে ফরয করেনি।

যে কোনো জাতির উন্নয়ন ও প্রগতি তার প্রকৃতিসুলভ হয়ে থাকে। নারীর উন্নতি এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে, সে সচ্চরিত্রা, সৎকর্মশীলা, সাদা মনের মানবী, লজ্জাবতী, আত্মমর্যাদাশালিনী এবং প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞানের অধিকারিণী হবে। সে সাংসারিক টুকিটাকি কাজকর্ম গুছিয়ে রাখবে, স্বামীর কথা মেনে চলবে, তার খেদমত করবে এবং সঠিকভাবে সন্তান লালনপালন করবে। তবে গর্ভকালীন সময় এবং বাচ্চা প্রসব হওয়ার পরবর্তী সময় নারীকে বিশ্রাম নিতে হয়। যা ঘর ছাড়া অন্য কোথাও সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, যে নারী বেপর্দায় চলে, সে স্বামীর খেদমত করতে পারে না। সন্তানসন্ততিদের যথাযথভাবে দেখাশোনা করতে পারে না।

বেপর্দা নারী নিজের স্বামীর জন্য যেমন দৃষ্টিনন্দন, পরিচিত বন্ধুবান্ধবের জন্যও নয়নপ্রীতিকর। তার আদর-সোহাগ থেকে স্বামী ও সন্তানরা বঞ্চিত হয়। বেপর্দার মাধ্যমে জাগতিক ও বস্তুগত কোনো প্রকার উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। বরং, এতে নৈতিক অবক্ষয় এত বেশি হয় যে, মানুষ ও পশুর মাঝে কোনো তফাত থাকে না।

বর্তমান প্রগতিশীল জাতির এমন অবস্থা হয়েছে, অলিগলি ও পাড়া-মহল্লায় হরেক নৃত্যসংঘ তৈরি হয়েছে। যেখানে তরুণ-তরুণীরা তাদের খেয়ালখুশি ও বেহায়াপনা পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ করতে পারে। একজন পরপুরুষ একজন বেগানা নারীকে তার স্বামীর সামনেই জড়িয়ে ধরছে। স্বামী শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বেপর্দা নারীর স্বামীর আত্মমর্যাদা বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। পশ্চিমা বিশ্বে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সেখানে জনসম্মুখে ব্যভিচারের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটছে। ধীরে ধীরে তারা মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুতে পরিণত হচ্ছে। নরপশুর যেমন মাদি পশুর সাথে সম্ভোগ-ইচ্ছা পূরণ করতে কোনো গোপনীয়তার প্রয়োজন পড়ে না; সভ্যতার দাবিদারদেরও তেমন ইচ্ছা, মুসলমান রমণীদের চারিত্রিক শুচিতা ও নৈতিকতা শেষ হয়ে যাক। তাদের সমাজও সেই 'সভ্য' পশুসমাজের মতো হয়ে যাক। তারা এই লজ্জাহীন অবস্থার নাম দিয়েছে 'প্রগতি'। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সুমতি দান করুন। আমিন।

ব্যভিচার রোধে ইসলাম

নারীর দিকে তাকালে পুরুষের মাঝে যেমন কামভাব সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে পুরুষের দিকে তাকালে নারীর মাঝেও এমন আসক্তির সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো এই কুদৃষ্টি থেকে অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্কের সূচনা হয়। পরিণতিতে ব্যভিচারের মতো জঘন্য কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়ে যায়। এজন্য চোখকে বলা হয় ব্যভিচারের ছিদ্রপথ। অন্যদিকে, সকল নবি-রাসুলের শরিয়তে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রজ্ঞায় এবং আত্মমর্যাদাবান লোকদের দৃষ্টিতে ব্যভিচার যে জঘন্য গুনাহ ও কদর্য কাজ, এক কথায় সবাই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। এজন্য প্রজ্ঞা ও আত্মমর্যাদার দাবি হলো—ব্যভিচারের দুয়ার একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া। ইসলাম ব্যভিচারের দুয়ারকে এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছে যে তার মধ্যে কোনো ছিদ্রপথই খোলা রাখেনি; যা দিয়ে উঁকি মারা যাবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামি শরিয়ত অনেক বিধিবিধান জারি করেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَـٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ، وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

হে নবি-পত্নীরা, তোমরা অন্য নারীদের মতন নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষদের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয়

> ভঙ্গিতে কথা বলো না; তাহলে যার অন্তরে রোগ রয়েছে সে প্রলুব্ধ হবে। তোমরা সংগত কথাবার্তা বলবে। তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে; জাহেলিযুগের মতো নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। নামাজ পড়ো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। হে নবি-পরিবার, আল্লাহ শুধু চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র করতে।[১]

নারীরা বিনা প্রয়োজনে তাদের ঘর থেকে বের হবে না। তাদেরকে বাড়ির অন্দরমহলে অবস্থান করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি নামাজটা পর্যন্ত তারা বাড়িতেই আদায় করবে। তাদের জন্য মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার চেয়ে বাড়িতে আদায় করার ফযিলত বেশি। কোনো প্রয়োজনে যদি বাড়ির বাইরে যেতেই হয়, তখন বোরকা বা চাদর দিয়ে সারা শরীর আবৃত করে বের হবে।

পরপুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে পর্দার আড়ালে থেকে কথা বলতে হবে। পরপুরুষের সামনে এসে বেপর্দায় কথা বলা সম্পূর্ণরূপে হারাম। পবিত্র কুরআনে এসেছে, “নবির স্ত্রীদের কাছে তোমরা কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।”[২]

পরপুরুষরা বেগানা নারীদেরকে দেখবে না এবং নারীরাও পরপুরুষদেরকে দেখবে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে ভালোই জানেন। আর মুমিন নারীদেরকেও বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।”[৩]

এখানে নারী-পুরুষকে পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন—তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং বেগানা ও পরপুরুষের দিকে দৃষ্টি না দেয়। কারণ, এই দৃষ্টিপাতই ফিতনার কারণ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার চেহারা

---

[১] সূরা আহযাব, আয়াত, ৩২-৩৩
[২] সূরা আহযাব, আয়াত, ৫৩
[৩] সূরা নূর, আয়াত, ৩০-৩১

হলো কামশক্তির কেন্দ্রবিন্দু, যা দৃষ্টিগোচর হলে মনে শয়তানি ও খারাপ চিন্তার আনাগোনা শুরু হয়। নারী-পুরুষ সবার চরিত্র ও নৈতিক শুদ্ধতা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

নারীরা তাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য তথা চেহারা ও হাত ছাড়া গোটা শরীর সর্বদা আচ্ছাদিত করে রাখবে। মুখমণ্ডল ও হাত সবসময় ঢেকে রাখা সাধারণত সম্ভব হয় না। গৃহস্থালির কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দেওয়ার সময় মুখ ও হাত খুলতে হয়। পবিত্র কুরআনে এ কথাও বিবৃত হয়েছে, তারা এই মুখ ও হাত কেবল নিজেদের মাহরাম পুরুষের সামনে খুলতে পারবে। পরপুরুষে সামনে খোলা বৈধ নয়। কারণ, এই চেহারাই তার সৌন্দর্যের উৎসস্থল। এতে পুরুষের মাঝে কামশক্তি সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময় এই ছিদ্রপথ বেয়েই ব্যভিচারের দুয়ার খুলে যায়। তবে তারা বাড়ির আঙিনায় নিজেদের বাবা, ভাই এবং অন্য মাহরাম পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখতে পারবে। এই অনুমতিও প্রয়োজনের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে।

কোনো নারীর জন্য প্রয়োজন ও বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুখমণ্ডল খোলা রাখা শরিয়তে অনুমদিত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, প্রবৃত্তিপূজারি পুরুষের জন্যও ঐ নারীকে দেখা জায়েজ। নারী প্রয়োজনে মুখ খুলতে পারবে; কিন্তু পরপুরুষ বিনা প্রয়োজনে ওই মুখ খোলা নারীকে দেখতে পারবে না। এমনকি স্বামী ছাড়া যেসব মাহরাম পুরুষের সাথে নারী দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারে তাদের মধ্যে কোনো মাহরাম যদি এমন হয়, যার ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা হয়—যেমন, কোনো নারীর মাহরাম ভাতিজা বা ভাগ্নে উশৃঙ্খল মেজাজের হয়—তখন তার সামনে মুখ খোলা জায়েজ নয়। ফিতনার আশঙ্কায় এমন মাহরামের সাথেও পর্দা করা জরুরি। কারণ, পর্দা হলো ব্যভিচার থেকে বাঁচার মোক্ষম হাতিয়ার।

স্ত্রীলোক যদি প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যায়, তবে সে যেন মোটা কাপড়ের বোরকা কিংবা মোটা চাদর পরিধান করে বের হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

। হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রী, মেয়ে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, ।

> তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[1]

প্রথম শর্ত, নারীদের জন্য পাতলা বোরকা কিংবা পাতলা চাদর পরিধান করে ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ। দ্বিতীয় শর্ত, তারা যেন খুব ভালো জামাকাপড় পরে বের না হয় এবং বের হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার না করে। তৃতীয় শর্ত, তারা যেন স্বামীর অনুমতি ছাড়া বের না হয়। চতুর্থ শর্ত, রাস্তায় হাঁটার সময় একপাশ দিয়ে চলবে। পুরুষের সাথে ঘেঁষাঘেষি করে পথের মাঝ বরাবর হাঁটবে না। আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. এর বর্ণনায় একটি হাদিসে এ কথা বিবৃত হয়েছে।

ইসলামি শরিয়ত ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করতে এই বিধানও দিয়েছে, কোনো পুরুষ যেন কারো ঘরে উঁকি না মারে। কেউ যেন কারো বাড়িতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করে। কোনো পুরুষ যেন কোনো বেগানা নারীর সাথে একান্তে মিলিত না হয়। ফিকহবিদরা লেখেন, অপরিচিত যুবতি নারীকে সালাম দেওয়াও নিষেধ। তার সাথে মুসাফাহা করা তো আরও জঘন্য। পুরুষের জন্য কোনো বেগানা নারীর ঘরে স্বামী বা মাহরাম ছাড়া রাত যাপন করা বৈধ নয়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে কারো ঘরে গিয়ে তার স্ত্রীর সাথে কথাবার্তা বলা নিষেধ।

পরপুরুষ বা পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা অভিশপ্ত কাজ। হাদিসে এসেছে, 'যে পুরুষ বেগানা নারীর দিকে তাকায় কিংবা যে নারী কোনো পরপুরুষের দিকে তাকায়, উভয়ই অভিশপ্ত।'

মোটকথা, ইসলামি শরিয়তে মেয়েদেরকে যে পর্দার বিধান দিয়েছে তা তাদের জন্য বন্দিদশা নয়। বরং, এটা অপবিত্র ও নোংরা দৃষ্টি থেকে তাদেরকে হেফাজত করার মোক্ষম উপায়। এটা তাদের সম্ভ্রম হেফাজতের রক্ষাকবচ। তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। যারা পর্দা করে না, তাদের সন্তানসন্ততি নৈতিকভাবে উৎকৃষ্ট হতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, পর্দানশিন নারীর সন্তানসন্ততি বংশীয় হয়ে থাকে। এমন নারীর গর্ভে যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে, তার ব্যাপারে তার স্বামী শতভাগ নিশ্চিত থাকে, এই বাচ্চা তারই ঔরসজাত সন্তান। পক্ষান্তরে, পর্দাহীন

[১] সূরা আহযাব, আয়াত, ৫৯

নারীর সন্তানের ব্যাপারে তার স্বামী তেমন আস্থা রাখতে পারে না।

বেপর্দার যে সয়লাব পশ্চিমা দেশেগুলোতে চলছে, এর কারণে সেখানকার অধিকাংশ পুরুষ নিজের সন্তানের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বলতে পারে না যে, এ আমার ঔরসজাত সন্তান। ইংল্যান্ডের এক ভদ্রমহিলা শত আফসোস নিয়ে নিজের দেশের নারী জাতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেটা অনূদিত হয়ে মিসরের আরবি সাময়িকী 'আল মানার'-এ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি:

"ইংল্যান্ডের নারীরা তাদের যাবতীয় ইজ্জত-সম্মান, ও সতীত্ব হারিয়েছে। তাদের মাঝে এমন নারী কমই আছে, যারা কখনো কোনো অনৈতিক কাজে জড়িত হয়নি। হায়া-শরমের বালাই নেই এখানে। লজ্জার নামগন্ধও নেই। মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় তারা এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, অবাধ অনৈতিক সম্পর্কের কারণে তাদেরকে মানুষ বলাই দায়। প্রাচ্যের মুসলমান রমণীদের দেখে আমার হিংসা হয়। তারা কত পবিত্র! কত সতী-স্বাধ্বী! অত্যন্ত দ্বীনদারি ও তাকওয়া নিয়ে স্বামীর সাথে গোছানো ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে। তাদের চরিত্র কখনো কালিমালিপ্ত হয় না। তাদের গর্ব যথার্থ। সেদিন বেশি দূরে নয়, ইংল্যান্ডের মহিলাদেরকে সতী-সাধ্বী করতে এবং তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম যথাযথভাবে হেফাজত করতে ইসলামের বিধান কার্যকর করা জরুরি হয়ে পড়বে।"

কুরআনে ব্যভিচারের সাজা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝٢

> ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ—প্রত্যেককে ১শ' করে বেত্রাঘাত করবে। আর আল্লাহর বিধান কার্যকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের করুণা না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখো। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[১]

ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ, এই দুই জনের শাস্তির বিধান হলো—এদের প্রত্যেককে ১শ' করে বেত্রাঘাত করা হবে। হে মুসলমানরা, আল্লাহর বিধান পালন করার ক্ষেত্রে এ দুই জনের ব্যাপারে তোমাদের মনে যেন দয়ার উদ্রেক না হয়। তোমরা যদি দয়াপরবশ হয়ে তাদের ছেড়ে দাও কিংবা শাস্তি লঘু করো; মনে রেখো, জাগতিক শাস্তির চেয়ে পারলৌকিক শাস্তি অনেক কঠিন ও ভয়াবহ। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো, তবে ইলাহি বিধান পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করো। তাতে শিথিলতা প্রদর্শন করো না। অন্যথায়, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরকালে জিজ্ঞাসা করবেন—'তোমরা আমার বিধান কার্যকরণে লোকদের ছাড় দিয়েছো। অথচ হক ছিল, তাঁর বিধান কার্যকরণে সাহসিকতা দেখানো।' তাই তোমরা যদি পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো,

[১] সূরা নূর, আয়াত, ২

তবে সেদিনের জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত দণ্ডবিধি কোনো ধরনের শিথিলতা ছাড়া পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করতে হবে। আর এ দুজনের শাস্তির সময় মুসলমানদের একটি দল যেন সেখানে উপস্থিত থাকে। যাতে লোকদের শিক্ষা ও উপদেশ মিলে।

ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হওয়া দরকার। যাতে এমন লাঞ্ছনা দেখে লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে। যদি কোনো আবদ্ধ ও গোপন স্থানে এই দণ্ড কার্যকর করা হয়, তবে আসল উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। আর এ শাস্তি সেই ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর জন্য যারা স্বাধীন, বিবেকমান, প্রাপ্তবয়স্ক এবং অবিবাহিত। এমন ব্যক্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'মুহসান-বিহি' বলে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি বিবাহিত এবং সহবাসের অভিজ্ঞতাও হয়েছে, এমন ব্যক্তিকে 'মুহসান' বলে। আলোচ্য আয়াতে মুহসান-বিহি তথা অবিবাহিত লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তাকে ১শ' বেত্রাঘাত করতে হবে। যে ব্যক্তি মুহসান তথা বিবাহিত এবং সহবাসও করেছে, এমন লোকের শাস্তি পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। অর্থাৎ, সবার সামনে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। এ সম্পর্কিত আলোচনা সূরা মায়েদায় রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ

> আর তারা কীভাবে আপনাকে ফয়সালাকারী বানায়? যখন তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে, যার ভেতর আল্লাহর ফয়সালা লিপিবদ্ধ আছে। এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়? আদতে তারা মুমিনই নয়।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এক ইহুদি পুরুষ ও এক ইহুদি নারীর ওপর ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করেন। দুজনই বিবাহিত ছিল বিধায় তাওরাত অনুসারে পাথর নিক্ষেপের বিধান কার্যকর করেছিলেন। সবাই সেটা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মেনে নিয়েছিল। কারণ, তাওরাতে বিবাহিত লোকের ব্যভিচারের বিধান ছিল পাথর মারা। নবিজি জনসম্মুখে এই শাস্তি কার্যকর করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। এখানে প্রস্তরাঘাতের

[১] সূরা মায়েদা, আয়াত, ৪৩

শাস্তিকে 'আল্লাহর ফয়সালা' বলা হয়েছে। নবিজি যখন এই ইহুদি সম্পর্কে রজম তথা প্রস্তরাঘাতের শাস্তি ফয়সালা করলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তোমার এ বিধান জীবিত করেছে। অথচ তারা তা বিলুপ্ত করে ফেলেছিল।'

যাই-হোক, নবিজি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথরের আঘাতে হত্যা করার শাস্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা সেই শাস্তিকে 'নিজের বিধান' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেই ঘটনার পর যত ব্যভিচারের ঘটনা ঘটেছিল, সকল ক্ষেত্রে নবিজি বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথরের আঘাতে হত্যা করার দণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। এ সম্পর্কে প্রচুর হাদিস বর্ণিত রয়েছে, যা সামগ্রিক বিচারে 'তাওয়াতুব' পর্যায়ে উন্নীত। নবিজির পর খোলাফায়ে রাশিদিন (নবুওয়াতের নমুনায় রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সাহাবিরা) এর আমলও তা-ই ছিল। এমনকি গোটা উম্মতের এ বিষয়ে ইজমা ও ঐকমত্য রয়েছে।

নবিজি এবং খোলাফায়ে রাশিদিনের আমল এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে, তাওরাতে রজম ও প্রস্তরাঘাতের যে বিধান ছিল, তা মুহাম্মাদি শরিয়তে আগের মতোই বহাল রয়েছে। যেমন, ঠান্ডা মাথায় খুন করার শাস্তি—হত্যা করা, যার বিধান পবিত্র কুরআনে তাওরাতের উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

> আর আমি তাদের প্রতি ওই কিতাবে লিখে দিয়েছিলাম— প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং ক্ষতের বদলে সমান ক্ষত। এরপর যে ক্ষমা করে দিল, তা তার জন্য কাফফারা হবে। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে যারা ফয়সালা করে না, তারাই জালিম।[১]

স্বেচ্ছায় হত্যা করার যে শাস্তি তাওরাতে রয়েছে, তা এই শরিয়তেও বহাল আছে।

[১] সূরা মায়েদা, আয়াত, ৪৫

সারকথা, আয়াতে যে ১শ' বেত্রাঘাত করার কথা বর্ণিত রয়েছে, তা সেই ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিধান যারা কি না অবিবাহিত। পক্ষান্তরে, যে বিবাহিত পুরুষ ও নারী এমন জঘন্য কাজ করে, তাদের শাস্তি হলো পাথরের আঘাতে হত্যা করা। যা সুস্পষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন সূত্রে একাধিক হাদিস, খোলাফায়ে রাশিদিন এবং সাহাবিদের ঐকমত্যে প্রমাণিত। এতে কারো অস্বীকৃতি জানানো বা খোঁড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ নেই।

উমর রা. সর্বশেষ হজ থেকে ফিরে আসার পর এবং তার শাহাদাতের একমাস আগে দীর্ঘ ভাষণে বলেছিলেন, "আমার আশঙ্কা হচ্ছে, লম্বা একটা সময় পার হবার পর কোনো লোক এ কথা বলতে পারে—আমরা আল্লাহর কিতাবে পাথর মেরে হত্যার বিধান পাচ্ছি না। ফলে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন এমন একটি ফরয ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে তারা বিপথগামী হবে। সাবধান, যখন প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভাবস্থা বা স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে, তখন যিনাকারীর জন্য পাথর মেরে হত্যার বিধান নিঃসন্দেহে অবধারিত।"[১]

উমর রা. তার সেই ভাষণে রজমের যে আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই পূর্ণ আয়াতটি হলো,

الشَّيخُ و الشَّيخَةُ إذا زَنَيا فَارْجُمُوْهُما الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ ، وَ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> বিবাহিত পুরুষ বা নারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তাদের দুজনকে অবশ্যই রজম করো অর্থাৎ, পাথর মেরে হত্যা করো।

রজমের এ বিধান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে শিক্ষাস্বরূপ। যাতে এমন শিক্ষণীয় শাস্তি দেখে লোকেরা ব্যভিচারের মতো জঘন্য কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, উমর রা. লোকদের ভাষণে বলেছেন, "রজমের বিধানের ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করো না। কারণ, এ বিধান সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।"

---

[১] বুখারি, হাদিস, ৬৮২৯
[২] ফাতহুল বারি, ১২/১২৭

অন্য রেওয়াতে এসেছে, উমর রা. বলেছেন, “যদি এ আশঙ্কা না থাকত যে, লোকেরা এ কথা বলবে, উমর নিজের পক্ষ থেকে কুরআনে সংযোজন করে, তবে আমি নিজের হাতে কুরআনের পাদটীকায় রজমের আয়াতটি লিখে দিতাম।”

বহু রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত, রজমের উপরিউক্ত আয়াতটি আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেলেও সর্বসম্মতিক্রমে তার বিধান বহাল রয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁর ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশিদিন ও সাহাবিরাও আমল করেছেন।

উমর রা. তার ওফাতের আগে বারবার রজমের বিধানের ঘোষণা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য ছিল, রজমের বিধান আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে কুরআনে নাযিল হয়েছে; এখন যদিও এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু তার বিধান রীতিমতো বহাল রয়েছে। এ বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, বিচ্যুত হওয়া সম্পূর্ণ গোমরাহি।[১]

উমর রা. আশঙ্কা করতেন, ভবিষ্যতে এমন কিছু লোক জন্ম নেয় কি না, যারা রজমের আয়াতকে অস্বীকার করে বসে। অজুহাত হিসেবে এটা দাঁড় করে, রজমের বিধান তো কুরআনে সুস্পষ্টভাবে নেই। এই ফিতনার ছিদ্রপথ বন্ধ করার মানসে তিনি বারবার রজমের আয়াত মিম্বারের সামনে ঘোষণা দিয়েছেন। যাতে আগামী দিনে কারো জন্য রজমের আয়াত অস্বীকার করার অবকাশ না থাকে।[২]

ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ; বহু অপরাধের সমষ্টি। তাই শরিয়তে এর শাস্তিও সর্ববৃহৎ রাখা হয়েছে। কুরআন কারীমে ও মুতাওয়াতির হাদিসে চারটি অপরাধের শাস্তি ও তার পন্থা স্বয়ং আল্লাহ্ নির্ধারিত করেছেন। কোনো বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের ওপর ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় “হুদুদ” বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শাস্তি এমন সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। বরং, শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে। এ ধরনের শাস্তিকে

[১] মারকানি রাহি. এর মুয়াত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ৪/১৪৫

[২] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

শরিয়তের পরিভাষায় 'তামিরাত' বা দণ্ড বলা হয়। হুদুদ চারটি— চুরি করা, কোনো সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা, মদ্যপান করা এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্বস্থলে গুরুতর, জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক এবং বহু অপরাধের সমষ্টি। কিন্তু সবগুলোর মধ্যে ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি সমাজব্যবস্থাতে যেভাবে আঘাত হানে, তেমন বোধহয় অন্য কোনো অপরাধে নেই।

১শ' কশাঘাতের উল্লিখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত বিধিবিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে গুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে। যেমন, মদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায় ক্রমিক বিধান স্বয়ং কুরআনে বর্ণিত আছে। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ۝١٥ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا ۝١٦

> আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন পুরুষকে সাক্ষী আনো। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে ব্যভিচারিণীদেরকে ঘরবন্দি রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে; অথবা, আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করে দেন (ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঘরবন্দি রাখো)। তোমাদের মধ্যে যে দুজন এই অপকর্ম করে তাদের শাস্তি দাও। এরপর তারা যদি তাওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।[১]

বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনোরূপ বিবরণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি ১শ' কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য

[১] সূরা নিসা, আয়াত, ১৫-১৬

নির্দিষ্ট এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। এ কথা ইবনু আব্বাস রা. এর কোনো হাদিসের প্রমাণ থেকে জেনে থাকবেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

'আমার কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করো। আল্লাহ তায়ালা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সূরা নিসায় প্রতিশ্রুত পথ সূরা নূরে বাতলে দিয়েছেন। তা হলো, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য ১শ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য ১শ' কশাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা।'[১]

সূরা নূরে উল্লিখিত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি ১শ' কশাঘাতের সাথে এই হাদিসে একটি বাড়তি সাজা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো, পুরুষকে এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। দেশান্তরিত করার এই শাস্তি পুরুষের জন্য ১শ' কশাঘাতের ন্যায় অপরিহার্য না। বিচারকের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল— তিনি প্রয়োজনবোধ করলে এক বছরের জন্য দেশান্তরও করে দিবেন। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আজমের মতে শেষোক্ত মতই নির্ভুল; অর্থাৎ, বিচারকের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল।[২]

মোটকথা, নিঃসন্দেহে ব্যভিচার অশ্লীল কাজ। ব্যভিচারের নিকৃষ্টতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ব্যভিচারের কারণে সমাজ ও পরিবারব্যবস্থা তছনছ হয়ে যায়। মানুষে মানুষে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। সমাজে ঝগড়া ও কলহ বাঁধে। ব্যভিচারের কারণে এমন অজস্র মন্দের ফটক খুলে যায়।

শাহ রাহি. লিখেছেন, 'যদি এই পথ খুলে যায়, তাহলে সে ব্যক্তি আবার অন্য কারোর স্ত্রীর দিকে তাকাবে। ব্যভিচার অত্যন্ত মন্দ পথ। প্রবৃত্তিপূজার পথ। আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন—তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না। এর ব্যাখ্যা হলো, কোনো পরনারীর দিকে চোখ তুলে তাকিও না। কোনো শারঈ প্রয়োজন ছাড়া পরনারীর দিকে তাকানো ব্যভিচারের কাছাকাছি ঠেলে দেয়। আর ব্যভিচারের কারণে বংশ ও সমাজব্যবস্থা তছনছ হয়ে যায়। তখন কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না, কে কার সন্তান। দ্বিতীয়ত, ব্যভিচারের ফলে প্রসূত সন্তানের

[১] হাদিসটি সহিহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে নাসায়ি, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং ইবনু মাজাহয় উবাদা ইবনু সামিত রা. এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে

[২] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

ভরণপোষণের দায়িত্ব কেউ বহন করে না। ব্যভিচারের ফলে মানুষ ও জন্তুর মাঝে কোনো ব্যবধান থাকে না। পশু যেমন স্বজাতির কোনো মাদি পেলেই নিজের জৈবিক চাহিদা মিটিয়ে ফেলে, তেমনি ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত থাকলে পুরুষরা নারী পেলেই যৌন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবে। পশুদের সমাজে যেমন বিবাহের প্রয়োজনীয়তা নেই, তেমনি ব্যভিচারের ফলে ব্যক্তিও বিয়ের প্রয়োজনবোধ করে না।

ব্যভিচারে বাধ্য করা বারণ

ব্যভিচারে বাধ্য করার নিষেধাজ্ঞা হিসেবে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> আর তোমাদের দাসীরা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে দুনিয়ার জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয়ই তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

জাহেলি যুগে আরব সমাজে একটা প্রথা চালু ছিল। পুরুষরা নিজের দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করত। পাশাপাশি তাদের ওপর কর আরোপ করত—তাকে মাসিক এত টাকা পরিশোধ করতে হবে। এভাবে সকল দাসী তার আয়ের উৎস হতো। আল্লাহ তায়ালা সেই প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—আর তোমরা নিজেদের দাসীদের যিনা-ব্যভিচারে বাধ্য করো না। বিশেষত যখন তারা নিজেদের পবিত্র রাখতে চায়। ব্যভিচারে কাউকে বাধ্য করা তো সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও নিন্দিত কাজ। তারপরও যে অবস্থায় দাসী চারিত্রিকভাবে পবিত্র থাকতে চায়, তখন সেটা অধিকতর নিন্দিত ব্যাপারে পরিণত হয়। এটা অতি গর্হিত ও লজ্জাজনক কাজ, তোমরা নিজেদের দাসীদের এজন্য ব্যভিচারে বাধ্য করো, যাতে এর মাধ্যমে তোমরা নিজেদের

[১] সূরা নূর, আয়াত, ৩৩

জীবনের কিছু স্বার্থ হাসিল করতে পারো এবং তাদের হারাম কামাই থেকে দুপয়সা হাতিয়ে নিতে পারো। এ লোভ-লালসায় কাউকে ব্যভিচারে ও জঘন্য কাজে বাধ্য করা খুবই লজ্জাজনক কাজ। আর যে ব্যক্তি তাদের ব্যভিচারে বাধ্য করে, তাদের সেই গর্হিত কাজকে এড়িয়ে চলার মনোবাসনা থাকার পরও—তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা সেই জোরজবরদস্তির পর ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

অপারগতা ও অসহায়ত্ব দেখা দিলে এবং উপায়ন্তরহীন অবস্থায় গুনাহ সাধিত হয়ে গেলে, আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে মাগফিরাতের আশা করা যায়।[১]

[১] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

জাহেলি যুগ বনাম ইসলামি যুগ

জাহেলি যুগে নারী জাতির ওপর নানা প্রকার জুলুম-নিপীড়ন চলত। তাদেরকে জীবজন্তুর চেয়ে অধিক তুচ্ছ; বরং কয়েদিদের মতো অসহায় অবস্থায় রাখা হতো। কেউ একই নারীকে শতবার তালাক দিত। তারপরও তার বিপদ শেষ হতো না। ইসলাম এবং নবিজি এই বুনো জুলুম-নিপীড়নকে মুলোৎপাটিত করে দিলেন। পবিত্র কুরআন নারীদের অধিকার নির্ধারিত করে দিয়েছে। বিয়ে-তালাকের বিধান নাযিল করে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের অধিকারসমূহ সম্পূর্ণরূপে হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন। সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এসব বিধানের খেলাফ করলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। কোথাও প্রাজ্ঞ দিকনির্দেশনাও দিয়েছে। এটিও একটি তাৎপর্যপূর্ণ মূলনীতি—আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

> এরপর তারা যখন তাদের ইদ্দতের সময়সীমায় পৌঁছাবে, তখন তাদেরকে নিয়মমতো রেখে দাও কিংবা নিয়মমতো তাদেরকে ছেড়ে দাও। আর নিজেদের মধ্য থেকে দুজন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখো। আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে। এর মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে।[১]

মোটকথা, কোনো অবস্থাতেই কখনো জুলুম-অবিচার করা যাবে না। আল্লাহ

[১] সূরা তালাক, আয়াত, ২

তায়ালার প্রতি ঈমান ও আখিরাতের ইয়াকিনই মানুষকে জুলুম-অবিচার থেকে বাঁচাতে পারে। এজন্য বলা হয়েছে—অপূর্ব এই উপদেশ সেই লোকদের জন্য উপকারী, যাদের খোদাভীতি রয়েছে এবং আখিরাতের প্রতি রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাস। এরপর অবহিত করা হয়েছে তাকওয়ার উৎকৃষ্ট ফলাফল ও বরকত সম্পর্কে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

> যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের পথ তৈরি করে দিবেন। তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দান করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।[১]

বলা হয়েছে, খোদাভীতি উভয় জাহানের সৌভাগ্য, ধনভান্ডারের চাবিকাঠি এবং যাবতীয় সাফল্যের মাধ্যম। এতেই যেকোনো সমস্যা সহজ হয়ে যাবে। ধারণাতীত রিযিকও লাভ করবে। অপূর্ব ও বর্ণনাতীত মানসিক প্রশান্তি হৃদয়রাজ্যে বিরাজ করবে। এরপর জটিলতা, আর জটিলতা থাকে না। তামাম পেরেশানিও তিরোহিত হয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'আমি একটি আয়াত জানি, যা গোটা বিশ্বের (সমস্যা দূর করার) জন্য যথেষ্ট।' জিজ্ঞাস করা হলো, 'কী সেই আয়াত?' তখন তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

> যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের পথ তৈরি করে দিবেন। তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দান করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।[২]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহি. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন তিনি নবিজির বাহনের পেছনে সহযাত্রী হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

[১] সূরা তালাক, আয়াত, ২-৩

[২] প্রাগুক্ত

'ভাতিজা, আল্লাহর হক ও বিধান যথাযথ সংরক্ষণ করো (মানে, পালন করো); তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করো, তাঁর সাহায্য তুমি প্রত্যক্ষ করবে। কোনো কিছু চাইলে আল্লাহর কাছে চাও। সাহায্যের দরকার হলে আল্লাহর সাহায্য চাও। মনে রেখো, গোটা মানবজাতি তোমার সামান্য উপকার করতে চাইলে শুধু ততটুকু করতে পারবে যা আল্লাহ তায়ালা তোমার ভাগ্যে রেখেছেন। তেমনি তারা যদি তোমার ক্ষতি করতে চায়, তবে শুধু ততটুকু করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে, খাতা শুকিয়ে গেছে (মানুষের ভাগ্যের লিখন শেষ হয়ে গেছে। এর আর কোনো পরিবর্তন হবে না)।[১]

ফায়েদা ১

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

> তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে, তখন তাদের ইদ্দত অনুসারে তালাক দিও।[২]

এখানে ইদ্দতের সময়-সুযোগ দেখে তালাক দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর দুটি মর্ম রয়েছে;

১। তালাক দেওয়ার সময় (তথা পবিত্রতাকাল) এবং
২। তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মেয়াদ।

তালাক দেওয়ার সময় বলতে সেই সময়কে বোঝানো হয়েছে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তালাক দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। সেটা হলো—পবিত্রতাকাল। সুতরাং, কেউ তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিবে না। কারণ, সে অবস্থায় তালাক দেওয়া খেলাফে সুন্নাত ও গুনাহের কাজ (ফিকহের কিতাবাদিতে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে)। তালাক দেওয়ার জন্য পবিত্রতাকালকে এ জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এ বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে যায়। বাস্তবিকপক্ষে, কোনো অপারগতার ভিত্তিতেই তালাক দেওয়া হয়েছে না কি সাময়িক কোনো ঘৃণা বা

[১] তিরমিজি, হাদিস, ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস, ২৬৬৯
[২] সুরা তালাক, আয়াত, ১

উত্তেজনায় (যেমন, হায়েয অবস্থা হওয়া) এ ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলেনি।

স্বামীর মৃত্যু অথবা তালাকের পর যে সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীর জন্য অন্য বিবাহ বৈধ নয়, এই সময়সীমাকেই ইদ্দত বলে। আর তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মেয়াদ বলতে সেই কথা বোঝানো হয়েছে যা অন্য আয়াতে এসেছে,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ

> যে নারীদের তালাক দেওয়া হয়েছে, তারা তিনবার হায়েয আসা পর্যন্ত নিজেদেরকে প্রতীক্ষায় রাখবে।[১]

হানাফি মাযহাব অনুসারে তালাকের ইদ্দত হলো তিন হায়েয, যে কথা আয়াতে বিবৃত হয়েছে। আর সেটি হলো পবিত্রতাকাল। কারণ, হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে তিন সংখ্যাটা ঠিক রাখা যায় না। যেমন ধরুন, কেউ হায়েয অবস্থায় (অর্থাৎ, হায়েয শুরু হওয়ার পর) তালাক দিল এবং সেটিও গণনা করা হলো, এতে ইদ্দত অবশ্যই পরিপূর্ণ তিন হায়েয থেকে কম হবে (কারণ, হায়েয শুরু হওয়া মানেই কিছু সময় অতিবাহিত হওয়া। আর অতিবাহিত সেই সময় তো কমে গেল)। পক্ষান্তরে, যে হায়েযে তালাক দেওয়া হয়েছে যদি সেটা বাদ দিয়ে নতুন করে তিন তালাক গণনা করা হয়, এতে ইদ্দত তিন হায়েযের চেয়ে একটু বেশি হয়ে যাবে (অথচ আয়াতে তিন সংখ্যা ঠিক রাখতে বলা হয়েছিল)।

সুতরাং, ইদ্দতের সময় ঠিক রেখে তালাক দিতে গেলে পবিত্রতাকালে তালাক দেওয়া অপরিহার্য। এটিই সুন্নাত তালাক। আলোচ্য আয়াতে لِعِدَّتِهِنَّ এর ل সময় অর্থে ব্যবহৃত হলে অর্থ দাঁড়াবে—তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাকের সময় তথা পবিত্রকালে তালাক দাও। আর মেয়াদ-মুদ্দদের অর্থে ব্যবহৃত হলে অর্থ দাঁড়াবে—তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ইদ্দতের মেয়াদ রক্ষা করে তালাক দাও। যাতে পরিপূর্ণ তিন হায়েয ঠিক থাকে। আর সেটাও পবিত্রতাকাল।

শরিয়তে তালাক অতি ঘৃণিত ও অপছন্দীয় কাজ। এজন্য এতে খুব কড়াকড়ি ও শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে যথাসম্ভব এটি না ঘটে। হাদিসে এসেছে—শয়তান তার সিংহাসন পানির (তথা সাগর-মহাসাগরের) ওপর স্থান করে এবং

[১] সূরা বাকারা, আয়াত, ২২৮

তার চ্যালাচামুণ্ডাকে দুনিয়ার মানুষকে গোমরাহ করতে পাঠায়। যখন তার অনুগামীরা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরেফিরে আসে এবং প্রধান শয়তানকে (ইবলিস) প্রত্যেকে রিপোর্ট শোনায়, তখন শয়তান প্রত্যেকের রিপোর্ট শোনে। কিন্তু কারো রিপোর্ট শুনে শয়তান তেমন সন্তোষ প্রকাশ করে না। অবশেষে এক ছোট শয়তান, যে এক কোণে বসে আছে। আর মনে মনে ভাবছে— আমি তো বিশেষ কোনো 'কীর্তি' আঞ্জাম দিতে পারিনি। না কাউকে দিয়ে চুরি করাতে পারলাম, না কাউকে দিয়ে ডাকাতি বা ব্যভিচার করাতে পারলাম। সবার শেষে সে বলে উঠল, আজ আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বাঁধিয়েছি। তীব্র ঝগড়ার এক পর্যায়ে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। সেই কাজ শেষ করে এখন আসলাম। খুদে শিষ্যের কথা শুনে বড় শয়তান এত বেশি খুশি হয় যে, আনন্দের আতিশয্যে সে তার পিঠ চাপড়াতে থাকে। বড় শয়তান তাকে বলে, বাহ-বাহ! তুমি! (বর্ণনান্তরে) তুমিই তো কামেল শয়তান!

ফায়েদা ২

إلا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

ইদ্দত পালনকারী স্ত্রী কোনো প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজে জড়িয়ে পড়লে তাকে ঘর থেকে বহিষ্কার করা হারাম নয় (এটা পূর্বের বিধানের ব্যতিক্রম)।

এখানে প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ বলতে কী বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে।

১। নির্লজ্জ কাজ বলতে খোদ ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা দৃশ্যত ব্যতিক্রম। যার উদ্দেশ্য, ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া নয়, বরং নিষেধাজ্ঞাকে আরো জোরদার করা। উদারণস্বরূপ বলা যায়, এ কাজ করা কারো উচিত নয় সেই ব্যক্তি ছাড়া যে মনুষ্যত্বই বিসর্জন দেয়। অথবা তুমি তোমার মাকে গালি দিও না, এটা ছাড়া তুমি তোমার মায়ের পুরো অবাধ্য হয়ে যাও। বলা বাহুল্য, প্রথম দৃষ্টান্তে ব্যতিক্রম দ্বারা সেই কাজের বৈধতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নয়; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে মায়ের অবাধ্যতার বৈধতা প্রমাণ করাও লক্ষ্য নয়। বরং বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তার আরো বেশি অবৈধ্যতা ও মন্দ হওয়ার বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

আয়াতের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ হলো, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর ঘর থেকে বের হবে না; কিন্তু যদি তারা অশ্লীলতায় মেতে উঠে বের হয়ে পড়ে তখন ভিন্ন কথা। সুতরাং এর অর্থ বের হয়ে যাওয়ার বৈধতা নয়। বরং আরো বেশি নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। নির্লজ্জ কাজের এই তাফসির আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. সুদ্দি, ইবনুস সায়েব, নাখয়ি রাহি. প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। আবু হানিফা রাহি. এই তাফসিরই গ্রহণ করেছেন।

২। নির্লজ্জ কাজ বলে ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ব্যভিচার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে, তার প্রতি শরিয়তের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য অবশ্যই তাকে ইদ্দতের ঘর থেকে বের করা হবে। এই তাফসির কাতাদাহ, হাসান বসরি, শাবি, যায়েদ বিন আসলাম, যাহহাক, ইকরিমা রাহি. প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইউসুফ রাহি. এই তাফসিরই গ্রহণ করেছেন।

৩। নির্লজ্জ কাজ বলতে কটুকথা, ঝগড়া-বিবাদ বোঝানো হয়েছে। এখানে আয়াতের অর্থ হবে—তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের ঘর থেকে বহিষ্কার করা জায়েজ নয়। কিন্তু যদি তারা কটু ভাষিণী ও ঝগড়াটে হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইদ্দতের সময় ঘর থেকে বহিষ্কার করা যাবে। এই তাফসির ইবনে আব্বাস রা. থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।

ফায়েদা ৩

لَا تَدْرِیْ لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

> সে জানে না (কিংবা তুমি জানো না) সম্ভবত আল্লাহ এই মনোমালিন্যের পর অন্য কোনো অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন।

অর্থাৎ, স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আরাম, সন্তানের লালনপালন এবং ঘরের সহজ ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করে স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহে রাখার ইচ্ছা করতে পারে। বাক্যের শুরুতে যে ক্রিয়াপদটি রয়েছে তার অর্থ দুটি হতে পারে; সে জানে না কিংবা তুমি জানো না। তবে প্রথম অর্থটিই শ্রেয়। ক্রিয়াপদটির কর্তা বিশেষ্য

হলো 'নাফস'। অর্থাৎ, কোনো নিপীড়িত ব্যক্তি জানে না যে, পরবর্তীকালে তার কেমন পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। এটা তো নিয়তি নির্ভর বিষয়। তাফসিরে মাআলিমুত তানযিল ও তাফসিরে খাযিনে আলোচ্য আয়াতের তাফসিরে এসেছে, "এরপর (অর্থাৎ তালাক দেওয়ার পর) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো বিষয় সৃষ্টি হওয়ার এই সম্ভাবনা যে—আল্লাহ তার অন্তরে নিজের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার ঝোঁক সৃষ্টি করে দিবেন, যাকে সে ইতঃপূর্বে এক তালাক বা দুই তালাক দিয়ে ফেলেছে।" এ কথায় প্রতীয়মান হয়, এটাই মুস্তাহাব, এক যোগে তিন তালাক না দেওয়া। বরং তাকে বিভিন্ন সময়ে এক এক করে তিন তালাক দেওয়া। যাতে স্বামীর সাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর লজ্জিত হলে বিবাহ বহাল রাখা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়।

ইমাম বাগাভি রাহি. এর এই তাফসির এবং কুরআন কারীমের শব্দের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থেকে এ কথা প্রতিভাত হয়েছে; একসাথে তিন তালাক দিলে, তাতে তিন তালাকই হয়ে যায়। যদি একসাথে তিন তালাক দিলে এক তালাকই হতো এবং সে কারণে তালাকে রজয়ির মতো স্ত্রীকে বিবাহে বহাল রাখারও সুযোগ থাকত— তবে এতে স্বামীকে অনুতপ্ত ও পস্তাতে হতো না। যা-হোক, তিন তালাকের পর স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া এবং সেই স্ত্রী স্বামীর জন্য একেবারে হারাম হয়ে যাওয়া উম্মতের ইজমা ঘটিত বিষয়। এ বিষয়ে সকল সাহাবি, তাবেঈন এবং উলামাগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এমন তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক অন্য কারো সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর সেই স্বামী যদি তালাক প্রদান করে কিংবা মারা যায়, সেক্ষেত্রে ইদ্দত পালনপূর্বক সেই স্ত্রী প্রথম স্বামীর সঙ্গে ঘর-সংসার করতে পারে।[১]

[১] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

তালাকপ্রাপ্তা নারীর বিধিবিধান

তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য বিশেষ কিছু বিধিবিধান আছে। তাদের অধিকার সম্পর্কিত বেশ কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে। বিশেষত তালাকপ্রাপ্তা নারী, যারা ঋতুবতী নয় কিংবা গর্ভবতী— তাদের ইদ্দত পালন এবং এ সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান গুরুত্বসহকারে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤ ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥ أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦ لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে,

> আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দেন। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেমন ঘরে বাস করো, তাদেরকেও বসবাসের জন্য তেমন ঘর দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ করো, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে। বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তারচেয়ে বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দিবেন।[১]

বলা হয়েছে, তোমাদের যে স্ত্রীদের ঋতু আসার কোনো আশা নেই, তোমাদের যদি কোনো ধরনের সন্দেহ হয়, তবে তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস। তেমনিভাবে সেই নারীদেরও, যারা ঋতুবতী হয়নি বয়স না হওয়ায় কিংবা কোনো রোগ ইত্যাদির কারণে—এমন নারীদের ইদ্দতও তিন মাস। আর যারা গর্ভবতী, তাদের ইদ্দত তাদের সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজে সমাধা করে দেন। সে নিজেও তা দেখে—কীভাবে কুদরতিভাবে তার সকল কাজ সহজেই সম্পন্ন হয়ে যায়।

যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপরাশি মোচন করেন; তার সওয়াব অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন। কাজেই মুমিনদের উচিত, জীবনের প্রতিটি স্তরে তাকওয়া অবলম্বন করা। মানুষ তার পরিবার ও জীবন নিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। প্রায়ই অনেক দুঃখ-কষ্ট ও জটিলতার মুখোমুখি হয়। এসব পরিস্থিতিতে আল্লাহর ওপর তাকওয়াই তাকে বিপদাপদ থেকে উদ্ধারে, পেরেশানি দূর করতে এবং জটিলতা সহজ করতে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি এই তাকওয়ার গুণ অর্জন করে মুত্তাকি হলো, তার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে

[১] সূরা তালাক, আয়াত, ৪-৭

এটিও একটি নিয়ামত— সেই তাকওয়ার নূরে তার পাপরাশি ও গাফিলতি মোচন হয়ে যায়। সে অপরিমেয় সওয়াব লাভ করে।

যা-হোক, নারী বিষয়ে বিশেষত যেসব নারী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে গেছে, তাদের অধিকার আদায়ে খোদাভীতি অবলম্বন করা জরুরি। তারা যেন কোনোভাবেই জুলুম-অবিচারে আক্রান্ত না হয়। সে জন্য সবসময় আল্লাহকে ভয় করা উচিত। এ ব্যাপারে পুরুষদের প্রতি আরো নির্দেশনা আছে—তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা ও ইদ্দতে থাকা নারীদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দাও, যেখানে তোমরা নিজেরা বাস করো। বসবাসের অধিকার বলে তারা তোমাদের ঘরে থাকবে। প্রয়োজনে তাদেরকে ভরণপোষণও দিতে হবে। তোমরা তাদের কষ্ট দিও না—তাদেরকে কোণঠাসা করার উদ্দেশ্যে। তাদের সংকটে ফেলে জীবন দুঃসহ করো না।

সাধারণ অবস্থায় ইদ্দতের সময় তিন হায়েয বা তিন মাসে পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয় তখন গর্ভকাল তিন মাসের চেয়ে বেশি থাকতে পারে। সুতরাং, তাদের জন্য ব্যয় করতে থাকো, যতক্ষণ না তারা সন্তান প্রসব করে। সন্তান প্রসব হলে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। সাথে সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও শেষ হয়ে যাবে। কাজেই সন্তানকে দুধপান করানোর দায়িত্ব স্ত্রীর ওপর বর্তাবে না। এমন পরিস্থিতিতে যদি সেই স্ত্রীরা তোমাদের জন্য স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দাও এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। যাতে কোনো ঝগড়-বিবাদ না হয় এবং কারো অধিকার খর্ব না হয়। তোমরা যদি জটিলতা অনুভব করো এবং উভয়ে কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে না পারো—তখন উত্তম হলো, অন্য কোনো দুগ্ধবতী নারী তাকে দুধপান করাবে। যাতে নিজেদের মধ্যে কোনো ধরনের কলহ-কোন্দল সৃষ্টি না হয়।

সন্তান লালনপালনের ব্যয়ভার পিতাই বহন করবে। প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উচিত, নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ভরণপোষণ দেওয়া। যার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকেই সে খরচ করবে। আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন কেবল তারই ভার তার ওপর অর্পিত হবে। আল্লাহ এর চেয়ে বেশি আরোপ করেন না। কেউ যদি আর্থিক টানাটানিতে থাকে, তার বোঝা উচিত—শীঘ্রই টানাটানি ও কষ্টের পর আল্লাহ আসানি সৃষ্টি করে দিবেন। সুতরাং,

সাময়িক অভাব-অনটন যেন অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত। তিনিই রহমতের দুয়ার খুলে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

> তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে, তাদের স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় রাখবে।[১]

এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—যে নারীর স্বামী মারা যায়, তার ইদ্দত স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে চার মাস দশ দিন। এটি নিতান্তই একটি সাধারণ বিধান। এতে সুনির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়নি কোন স্ত্রীলোকের জন্য এই বিধান প্রযোজ্য—গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জন্য, না কি গর্ভবতী নয় এমন স্ত্রীলোকের জন্য (কারণ, যে স্ত্রী রেখে স্বামী মারা গেল, সে স্ত্রী গর্ভবতী থাকতে পারে আবার গর্ভবতী নয় এমনও হতে পারে)। তবে এই আয়াতের সঙ্গে যদি সূরা তালাকের আলোচ্য আয়াতখানা মেলানো যায়, তখন এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়, সূরা বাকারায় কেবল গর্ভবতী নয় এমন স্ত্রীলোকের ইদ্দতের বিধানই বর্ণিত হয়েছে।

সারকথা, যেকোনো গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দত, সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। চাই তার স্বামী মারা যাক কিংবা সে তালাকপ্রাপ্তা হোক— যেমনটা সূরা তালাকে বলা হয়েছে। আর মারা যাওয়া লোকের স্ত্রী যদি গর্ভবতী না হয়, তবে তার ইদ্দতের সময়সীমা হবে চার মাস দশ দিন—যেমনটা সূরা বাকারায় আমরা জানতে পারি।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর মতে, সূরা তালাকের আলোচ্য আয়াতটি সূরা বাকারার আয়াতের পর নাযিল হয়েছিল। শুরুতে কোনো কোনো সাহাবির এমন ধারণা ছিল, স্বামী মারা যাওয়া স্ত্রীলোক যদি গর্ভবতী হয়, তখন সন্তান প্রসব ও চার মাস দশ দিন, উভয়টি থেকে যার সময়সীমা বেশি সেটি পালন করবে। অর্থাৎ, স্বামী মারা যাওয়ার পর যদি আগে সন্তান প্রসব করে, তখন চার মাস দশ দিন তার ইদ্দতের সময়সীমা হিসেবে গ্রহণ করা হবে। আর যদি স্বামী মারা যাওয়ার পর

[১] সূরা বাকারা, আয়াত, ২৩৪

চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সন্তান প্রসব করে, তখন সন্তান প্রসবের সময়কে তার ইদ্দত সমাপ্তের দিন হিসেবে গণ্য করা হবে। আলি ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে এমনটাই বর্ণিত।

অধিকাংশ সাহাবি এবং ফিকাহবিদদের মত হলো—স্বামী মারা যাওয়ার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেও যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। সহিহ বুখারিতে আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত; এক লোক ইবনে আব্বাস রা. এর কাছে এল। সে সময় আবু হুরায়রা রা.ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লোকটি বলল, 'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আমি আপনাকে এক মহিলা সম্পর্কে একটি ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে চাই। এক গর্ভবতী নারী, স্বামী মারা যাওয়ার চল্লিশ দিনের মাথায় সন্তান প্রসব করল। এখন সে কীভাবে ইদ্দত পালন করবে?' আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. জবাব দিলেন, 'উভয় ইদ্দত থেকে যার সময়সীমা বেশি, সেটা পালন করবে। দেখতে হবে সন্তান প্রসবের সময় বেশি, না কি চার মাস দশ দিন সময় বেশি। যেটা বেশি সেটাই ইদ্দতের সময়সীমা। আর সেটাই তাকে পালন করতে হবে।' এরপর লোকটিকে কুরআনের এ আয়াত শোনালেন—যারা গর্ভবতী, তাদের ইদ্দতের মেয়াদ হলো তাদের সন্তান প্রসব থেকে। তাহলে বোঝা যায়, যেকোনো গর্ভবতী নারীর ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব। জবাবে আবু হুরাইরা রা. বলতে লাগলেন, 'এ বিষয়ে আমি ভাতিজার (আবু সালামা) সঙ্গে রয়েছি (অর্থাৎ, আমি তার সঙ্গে একমত)।' বিষয়টির সঠিক সমাধানের জন্য, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তার দাসকে উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রা. এর কাছে পাঠালেন। উম্মে সালামা রা. জানালেন, নবিজির সময় এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। সুরাইয়্যা আসলামি রা. এর স্বামীকে খুন করা হয়। তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। স্বামী মারা যাওয়ার চল্লিশ দিন পর সুরাইয়্যা রা. সন্তান প্রসব করেন। প্রসূতি স্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর তার কাছে বিবাহের সম্বন্ধ আসে। কিন্তু কিছু আত্মীয়ের অভিযোগ-আপত্তির কারণে তিনি নবিজিকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। নবিজি তাকে বিবাহের অনুমতি দেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.ও এমন নারীর উভয় মেয়াদের দূরবর্তী মেয়াদকেই ইদ্দত হিসেবে সাব্যস্ত করার ব্যাপারটি নাকচ করতেন। সূরা তালাকের আলোচ্য

আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, এই আয়াতের পর এ সংক্রান্ত অন্য কোনো আয়াতই নাযিল হয়নি।' মাসরূক রাহি. বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যখন জানতে পারলেন, আলি রা. 'আব-আদুল আজালাইন' বা দুই মেয়াদের দূরবর্তী মেয়াদের সমর্থক, তিনি কড়াভাবে তা খণ্ডন করেছিলেন। এ ব্যাপারে বলেছিলেন, 'আমি এ বিষয়ে 'মুলাআনা' করতে প্রস্তুত, এ আয়াতখানা সূরা বাকারার পর নাযিল হয়েছিল।' কোনো কোনো বর্ণনায় এমনটাও রয়েছে, উবাই বিন কা'ব রা. নবিজির কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "যারা গর্ভবতী, তাদের ইদ্দতের মেয়াদ হলো তাদের সন্তান প্রসব।' এই আয়াতটি তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, না কি স্বামী মারা যাওয়া নারীর ক্ষেত্রে?" জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'উভয় নারীর জন্য আয়াতখানা প্রযোজ্য।' বর্ণনাটির সূত্র যদিও দুর্বল। কিন্তু একই বিষয়ে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় হাদিসশাস্ত্রের মূলনীতি আলোকে এটি গ্রহণযোগ্য। সর্বোপরি, এই ব্যাপারে সুবাইআ আসলামিয়্যাহর বর্ণনা—যা ইমাম বুখারি, মুসলিম এবং অন্য হাদিসবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন—সেটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য ও প্রামাণ্য।

তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ

ইদ্দত হলো বিয়ের বিধান ও অধিকার সংক্রান্ত একটি বিষয়। শরিয়তের এই মৌলিক বিধানের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট, তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য ইদ্দতকাল অতিবাহিত করার জন্য স্বামীর ওপর কিছু জরুরি দায়িত্ব থাকে। যেমন, সে স্ত্রীকে থাকার জায়গা দিবে, শরিয়তের পরিভাষায় যাকে 'সুকনা' বলে। শরিয়তের নির্দেশ অনুযায়ী, সেই নারী যেহেতু ইদ্দতের সময়টাতে ঘর থেকে বের হতে পারবে না, এতে স্বভাবত তার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপরই বর্তাবে। পবিত্র কুরআনে বলা আছে, "তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দাও, যেখানে তোমরা নিজেরা বাস করো।"[১]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য যথাসম্ভব থাকা ও ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করা স্বামীর জন্য জরুরি। কিছু কিছু হাদিসবিশারদ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর 'মুসহাফ' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এই আয়াতের অংশটুকু একটু বাড়িয়ে তিলাওয়াত করতেন,

وَ أَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ

। তোমরা তাদের ব্যয়ভার বহন করো। ।

তার কিরাত ছিল,

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ و أَنفِقُوْا عَلَيهِنَّ مِنْ وُجدِكُمْ

তার ছাত্ররা এই বাড়তি অংশটুকু নিজ নিজ মুসহাফের পাদটীকায় লিখে

[১] সূরা তালাক, আয়াত, ৬

রেখেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা ও মালিক রাহি. এর মতে, ভরণপোষণ যেকোনো তালাকপ্রাপ্তা নারীই পাবে। যেমন, যে স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে, যে ঋতুবতী হয়নি কিংবা যে গর্ভবতী—এ ব্যাপারে কারো কোনো বিশেষত্ব নেই। বরং বসবাসের অধিকার যেমন সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য, তেমনি ভরণপোষণও সর্বপ্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রাপ্য; যা তালাকদাতা স্বামী আদায় করবে।

ফাতিমা বিনতে কায়েস রা.-কে তিন তালাক দেওয়া হয়েছিল। তার বর্ণনায় পাওয়া যায়, 'আমার জন্য নবিজি ভরণপোষণ ও বসবাসের অধিকার সাব্যস্ত করেননি'—এটি প্রামাণ্য নয়। ফিকাহবিদ ও হাদিস বিশারদগণের বিচার-বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা অনুসন্ধান করে জানা যায়, এই মহিলা ঝগড়াটে ছিল। কোনোভাবেই শ্বশুরালয়ের লোকজনের সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছিল না। যে কারণে বসবাসের অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। হাদিসের বর্ণনায় এ ব্যাপারে অনেক সমর্থন পাওয়া যায়। এ নারী যখন বসবাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো, তখন ভরণপোষণও তার হাতছাড়া হয়ে গেল। যেমনটা অবাধ্য নারীর জন্য বিধান—যে নারী অবাধ্যতা করে স্বামীর বাড়ি থেকে চলে আসে, সে খরচা পায় না।[১] তবে তিরমিজি ও অন্য সুনান কিতাবের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, তাকে ভরণপোষণ দেওয়া হয়েছিল। তার স্বামী কারো মাধ্যমে সেই খরচা পাঠিয়েছিল। কিন্তু এই নারী আরো কিছু বাড়তি দাবি জানিয়েছিল, যা নবিজি মঞ্জুর করেননি। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার জন্য এতটুকু খরচাই যথেষ্ট। তবে তুমি যদি গর্ভবতী হতে এবং গর্ভের সময় দীর্ঘায়িত হতো, তখন বাড়তি খরচা পেতে।'

নারীটি বাড়তি যে খরচের দাবি জানিয়েছিল, নবিজি মূলত সেই বাড়তি খরচা নাকচ করেছিলেন, সাধারণ যে খরচা তার প্রাপ্য, তা নাকচ করেননি। কিন্তু, ফাতিমা বিনতে কায়স রা. বলে বেড়াত, নবিজি তার জন্য কোনো ধরনের ভরণপোষণ ও সুকনা (থাকার জায়গা) এর ফয়সালা দেননি। ফাতিমার এ বর্ণনা এবং এ ধরনের আক্ষেপকে সাহাবিরা, বিশেষত উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. ও আমিরুল মুমিনিন উমর রা. পছন্দ করতেন না। এ ব্যাপারে আয়িশা রা. বলেন, "ফাতিমার কী হলো! সে আল্লাহকে ভয় করে না? সে বলে বেড়ায় যে, নবিজি

---

[১] জাসসাস, আহকামুল কুরআন

তার জন্য ভরণপোষণ ও থাকার জায়গার ফয়সালা দেননি।' উমর রা. বলতেন, 'আল্লাহর কসম, আমরা আল্লাহর কিতাব ও নবিজির সুন্নাতকে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারি না নিছক এক নারীর কথায়। জানি না সে সঠিক বিষয়টি বুঝেছে কি বুঝেনি, না কি তার ভুল হয়ে গেছে।' এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়, তালাকপ্রাপ্তা নারী ভরণপোষণ ও সুকনা (থাকার জায়গা) সবকিছুই পাবে। উমর রা. আল্লাহর কিতাব বলতে আলোচ্য আয়াতকেই বুঝিয়েছেন। আর নবিজির সুন্নাত বলতে উমর রা. কর্তৃক বর্ণিত তাহাবি ও দারাকুতনির জাবির রা. বর্ণিত রেওয়ায়েতকে বুঝিয়েছেন।

হিদায়াত এবং গোমরাহি

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ

> আল্লাহ কাফেরদের জন্য নুহ এবং লুতের স্ত্রীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই ধর্মপরায়ণ বান্দার ঘরে। এরপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নুহ ও লুত তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না। তাদেরকে বলা হলো, জাহান্নামিদের সঙ্গে জাহান্নামে চলে যাও। [১]

তারা দুজনই ছিলেন নবির স্ত্রী। কিন্তু ঈমানের সাথে সম্পর্কহীন হওয়ার কারণে, পারিবারিক সম্পর্ক তাদের কোনো কাজেই আসেনি। অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সাধারণ কাফেরদের সাথে তাদেরকেও জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হলো।

তাদের বিপরীতে আছেন এক ঈমানদার নারী, যাকে আল্লাহ কুরআনে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

[১] সূরা তাহরিম, আয়াত, ১০

> আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে (আসিয়া) বলল, প্রভু আমার, আপনার কাছাকাছি জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দিন। আমাকে ফিরআউন ও তার খারাবি থেকে উদ্ধার করুন। আমাকে জালিম এই জাতি থেকে মুক্তি দিন।[১]

ফিরআউন যখন স্ত্রীর ঈমানের কথা জানতে পারল, তখন তাকে কঠিনতর শাস্তি দিতে শুরু করল। তার হাত-পায়ে কীলক গুঁজে কষ্ট দিতে লাগল। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ঈমানের ব্যাপারে পূর্ণ অবিচল থেকে নিজ পালনকর্তার কাছে আখিরাতের নিয়ামতরাজি প্রার্থনা করেছিলেন স্ত্রী আসিয়া। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আরো বলেছেন,

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا
وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ

> আর ইমরান কন্যা মারইয়ামের (দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছি), যে তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করেছিল। এরপর আমি তার মধ্যে ফুঁকে দিলাম আমার পক্ষ থেকে একটি প্রাণ। সে নিজ পালনকর্তার বাণী ও তাঁর কিতাবগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল। সে ছিল ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[২]

এভাবেই এই দুই নারী দুনিয়ার বুকে ঈমানদার নর-নারীর জন্য আদর্শ হয়ে গেল। তাদের ঈমান ও তাকওয়াকে দুনিয়ার সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হলো। পৃথিবীর নারী জাতিকে আহ্বান করা হলো—তোমরা ইমরান কন্যা মারইয়াম ও ফিরআউন-পত্নী আসিয়ার মতো ঈমান ও তাকওয়ার পরিপক্কতা অর্জন করো। এটা জানা কথা, আসিয়া যদিও বাহ্যিক সম্পর্কে ফিরাউনের স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহর ওপর ঈমান আনলেন, তখন থেকে ফিরআউনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেজন্য ফিরআউনের অবাধ্যতার আযাব তার প্রতি নাযিল হওয়ার পরিবর্তে, তিনি জীবদ্দশায়ই পেয়ে গেছেন জান্নাত লাভের সুসংবাদ। তাকে জান্নাতের সেই প্রাসাদ দেখানো হয়েছিল যা তার জন্য মহান

[১] সূরা তাহরিম, আয়াত, ১১
[২] সূরা তাহরিম, আয়াত, ১২

আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন। যাতে সেই প্রাসাদ ও আখিরাতের সুখ-শান্তির উপকরণ দেখে, তার জাগতিক সকল দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয়ে যায়।[১]

এই দৃষ্টান্তগুলো দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, একজন মুমিনের ঈমান তার কাফের আত্মীয়স্বজনের উপকারে আসে না। তাই নবি ও ওলিদের স্ত্রীরা যেন নিশ্চিন্ত না হয়, তারা তাদের স্বামীদের ওসিলায় মুক্তি পেয়েই যাবে। বিপরীতে, কোন কাফের ও পাপাচারীর স্ত্রী যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়, স্বামীর কুফরী ও পাপাচারের জন্য সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বরং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের ঈমান ও সৎকর্মের চিন্তা করা উচিত।

মুসা আ. যখন জাদুকরদের মোকাবিলায় সফল হন এবং জাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়, তখন আসিয়া তার ঈমান প্রকাশ করেন। ফিরআউন ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইল। কিছু রেওয়ায়েতে আছে, ফিরআউন আসিয়ার হাত-পায়ে পেরেক মেরে বুকের ওপর ভারী পাথর রেখে দিল। যাতে তিনি নড়াচড়া পর্যন্ত করতে না পারেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে অবিরত দুআ করেন। আবার কোনো রেওয়ায়েতে আছে, ফিরআউন ওপর থেকে একটি ভারী পাথর তার মাথার ওপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে, আসিয়া এই দুআ করেন। ফলে আল্লাহ তায়ালার হুকুমে মালাকুল মউত তার জান কবজ করে নেন এবং পাথরটি নিষ্প্রাণ দেহের ওপর পতিত হয়। আসিয়া দুআয় বলেছিলেন—প্রভু আমার, আপনি নিজের সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন। অথচ আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতেই তাকে জান্নাতের ঘর দেখিয়ে দেন।[২]

বিশিষ্ট তাফসিরকারক ইবনে কাসির রাহি. তার অনবদ্য তাফসির গ্রন্থে ফিরআউনের স্ত্রীর ঈমান গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে আবুল আলিআর রেওয়ায়েত সংকলন করেছেন। তার মতে, প্রাসাদের এক কোষাধ্যক্ষের স্ত্রীর ওসিলায় ফিরআউনের স্ত্রী ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাটা এমন ছিল, একদিন সেই মহিলা ফিরআউনের এক কন্যার চুলে বিনুনি করছিল। হঠাৎ তার হাত থেকে চিরুনি খসে পড়ল। সে চিরুনিটা কুড়ানোর সময় বলল 'বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে)।' ফিরআউনের মেয়ে একথা শুনে বলল, 'আমার বাবা ছাড়াও কী

[১] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে
[২] মাযহারি

তোমার কোনো রব আছে?’ মহিলা জবাব দিলেন, ‘হ্যাঁ। তিনি আমার রব, তোমার বাবারও রব। এমনকি বিশ্ব জগতের প্রত্যেক বস্তুর রব। আমি কেবল সেই রবেরই ইবাদত করি।’ এ কথা শুনে ফিরআউনের মেয়ে সেই দাসীর মুখে থাপ্পর মারল; পরে নিজের বাবা ফিরআউনকে ঘটানাটা বলল।

ফিরআউন ঐ দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি আমি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো?’ সে বলল, ‘হ্যাঁ। আমি আমার রব, তোমারও রব এবং প্রত্যেক বস্তুর রবের ইবাদত করি। আমি কেবল তাঁরই ইবাদত করে যাব।’ এ কথা শুনে ফিরআউন তাকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দিতে লাগল। এমনকি তার হাত-পায়ে পেরেক মেরে তার ওপর সাপ ছেড়ে দিল।

মোটকথা, এভাবে ফিরআউন তাকে দিনের পর দিন নানান কঠিন শাস্তি দিতে থাকে। একদিন ফিরআউন এসে দেখে, মহিলা তার ঈমানের ওপর এখনো অবিচল। ধমকের সুরে সে বলল, ‘তুমি কি থামবে না?’ দাসী জবাব দিল, ‹আমার রব, তোমার রব এবং সবকিছুর রব এক আল্লাহ।› ফিরআউন বলল, ‹তুমি নিবৃত্ত না হলে আমি তোমার চোখের সামনে তোমার বাচ্চাকেই জবাই করে দিব।› দাসী জবাব দিল, ‘তুমি যা খুশি করতে পারো।’ এরপর ফিরআউন দাসীর চোখের সামনে তার বাচ্চাকে জবাই করে দিল। এতে তার সন্তানের রূহ তাকে সুসংবাদ দিল, ‹মা তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। তুমি আল্লাহর কাছে এমন এমন প্রতিদান পাবে।› তখন সেই দাসী ধৈর্যধারণ করল।

কয়েকদিন পর ফিরআউন আবার এসে দাসীকে বলল, ‘তুমি কি নিবৃত্ত হবে না?’ দাসী আগের মতোই জবাব দিল। পরে ফিরআউন দাসীর সামনে তার আরেক সন্তানকে জবাই করে দিল। এই সন্তানের রূহও আগের সন্তানের রূহের মতো তার মাকে সুসংবাদ দিল এবং বলল, ‘তুমি ধৈর্যধারণ করো। মহান আল্লাহর কাছে তোমার জন্য এমন এমন প্রতিদান রয়েছে।’

এদিকে ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া দাসীর জবাই হওয়া বড় ও ছোট সন্তানের রূহের কথা শুনতে পেয়ে ঈমান আনেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা কোষাধ্যক্ষের স্ত্রীর রূহ কবজ করে নেন; তার জন্য জান্নাতে কী কী প্রতিদান, মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে, তা ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়ার কাছে মেলে ধরেন। এগুলো দেখে তার ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা ফিরআউনের স্ত্রীর ঈমানের

বিষয়টি ফিরআউনকে অবহিত করেন। একদিন ফিরআউন তার পরিষদবর্গকে বলল, 'তোমরা আসিয়া বিনতে মুযাহিম সম্পর্কে কী জানো?' সকলে তার প্রশংসা করল। ফিরআউন বলল, 'সে তো আমার ইবাদত করে না। অন্য কারো ইবাদত করে।' এবার পরিষদবর্গ বলল, ‹তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলুন।' এরপর ফিরআউন তার স্ত্রীর হাতে-পায়ে পেরেক গেঁথে বেঁধে ফেলে রাখে। তখন আসিয়া তার রবের কাছে দুআ করেন—'প্রভু আমার, আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করুন। আমাকে ফিরআউন ও তার কুফরি কর্ম হতে মুক্তি দিন। আমাকে নাজাত দিন জালিম সম্প্রদায় হতে।' এ সময় ফিরআউন হাজির হলো, আল্লাহ তায়ালাও তখন দুনিয়াতেই আসিয়াকে জান্নাতের ঘর দেখিয়ে দেন। যা দেখে তিনি হেসে দেন। এটা দেখে ফিরআউন বলল, 'দেখো, কত বড় পাগলি! আমি তাকে শাস্তি দিচ্ছি আর সে কি না হাসছে?' ইতোমধ্যে আল্লাহ তায়ালা আসিয়ার রূহ কবজ করেন এবং তখন তিনি জান্নাতে।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> "পুরুষদের মধ্যে অনেকেই সফল ও সিদ্ধ পুরুষ হয়েছেন। কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ইমরান তনয়া মারইয়াম ও ফিরআউন পত্নী আসিয়া সিদ্ধি লাভ করেছেন। অন্য নারীদের চেয়ে আয়িশার শ্রেষ্ঠত্ব তেমন, যেমন অন্য খাবারের চেয়ে 'সারিদ' (আরবদের একপ্রকার মিষ্টান্ন) এর শ্রেষ্ঠত্ব।[২]

বর্ণনায় এসেছে, ফিরআউনের স্ত্রী তিনিই ছিলেন, যিনি মুসা আ.-কে লালনপালন করেছিলেন। তিনি মুসা আ.-কে দরিয়ার ভাসমান অবস্থায় সিন্দুক থেকে উদ্ধার করেন। যার বিস্তারিত বিবরণ সূরা কাসাসে রয়েছে। ফিরআউন যখন জানতে পারল, তার স্ত্রী আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, তখন তাকে নানা ধরনের কষ্ট দিতে শুরু করেছিল। অবশেষে সে স্ত্রী আসিয়াকে হত্যা করল। নবিজি ফিরআউন পত্নীর পরিপূর্ণ ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন।[৩]

হিদায়াত পাওয়া সহজ হলেও, তা ধরে রাখা কষ্টকর। মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান টিকিয়ে

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির, ৮/১১৪

[২] বুখারি, হাদিস, ৩৪১১; মুসলিম, হাদিস, ৬৪২৫; তিরমিজি, হাদিস, ১৮৩৪

[৩] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

রাখা বড্ড কঠিন। আল্লাহ তায়ালা যাকে ভালোবাসেন তাকেই হিদায়াত দান করেন। উল্লেখ্য, নবিদের স্ত্রীরাও গোমরাহ হয়েছিল। বিপরীতে অবাধ্য, অত্যাচারী, আল্লাহ্ তায়ালার প্রকাশ্য দুশমনদের স্ত্রীরাও ছিল পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী।

মুহাজির নারী এবং বাইআত

কুরআনে বর্ণিত বিশেষ কিছু বিধান এমন নারীদের সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে যারা হিজরত করে 'দারুল ইসলাম' তথা মুসলিম দেশে আগমন করেছিল। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ مُهَـٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَـَٔاتُوا۟ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ۝١١ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝١٢ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْقُبُورِ ۝١٣

। মুমিনরা, যখন তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে আগমন।

করে, তখন তাদেরকে পরখ করো। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোই জানেন। যদি তোমরা জানো, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। তারা কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফেররাও তাদের জন্য হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছো, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে থেকে যায়; এরপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করো। আল্লাহকে ভয় করো, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখো। হে নবি, মুমিন নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে—তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। মুমিনরা, আল্লাহ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে।[১]

আলোচ্য আয়াতসমূহে হিজরতকারী নারীদের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঘটনা হলো—হুদায়বিয়ায় দশ বছর মেয়াদি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তাতে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়। চূড়ান্ত সেসব শর্তের মধ্যে একটি শর্ত ছিল এমন, মক্কা থেকে কোনো ব্যক্তি মদিনায় চলে গেলে নবিজি তাকে মক্কায় ফেরত

[১] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত, ১০-১৩

পাঠিয়ে দিবেন; যদিও সে মুসলমান হয়।

কিন্তু মদিনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কুরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। যে কয়জন পুরুষ মুসলমান মক্কা থেকে মদিনায় এসেছিল, চুক্তি অনুসারে নবিজি তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। যেমন, আবু জন্দল ইবনে সুহাইল রা.-কে মক্কার কুরাইশদের হাতে সোপর্দ করেছিলেন। অথচ আবু জন্দল রা. মক্কায় কাফেরদের কয়েদখানায় বন্দি ছিলেন। কোনো রকমে সেখান থেকে পালিয়ে নবিজির কাছে মদিনায় এসেছিলেন। শান্তি চুক্তিতে যেহেতু কেবল পুরুষ লোকের কথা উল্লেখ ছিল, সে জন্য নারীদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ বিবেচনায় নবিজি নারীদের ফেরত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, যারা কাফেরদের বন্দিখানা থেকে কোনো মতে পালিয়ে মদিনায় পৌঁছেছিলেন। যেমন, আসলাম গোত্রের সাবিনা বিনতে হারিস রা.-কে ফেরত নেওয়ার জন্য তার স্বামী ছুটে হুদায়বিয়া প্রান্তরে এসেছিল। বর্ণনায় পাওয়া যায়, এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যখন উম্মে কুলসুম রা. হিজরত করে মদিনায় নবিজির দরবারে এসে পৌঁছালেন, তখন তার পিছু পিছু দুই ভাই উমারা ও ওয়ালিদ মক্কা থেকে খুব দ্রুত নবিজির কাছে এসে পৌঁছায়। বোনকে ফেরত নেওয়ার জন্য আলোচনা করে। নবিজি তখন উম্মে কুলসুম রা.-কে ফেরত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানান। 'তবে তোমরা তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না'—কুরআনের এই আয়াতখানা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, স্বাক্ষরিত চুক্তিতে নারীরা শামিল নয়। আয়াতে হিজরত করে আসা নারীদেরকে পরখ করা এবং বাইআত সম্পর্কীত কিছু বিধিবিধানও আলোচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে,

> মুমিনরা, যখন তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরখ করো। [১]

অর্থাৎ, তারা ঈমান ও ইখলাস তথা বিশ্বাস ও আন্তরিকতা নিয়ে হিজরত করেছে কি না, তা ভালোভাবে যাচাই করে নিয়ো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ ভালোই জানেন। [২]

---

[১] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত, ১০
[২] প্রাগুক্ত

তবে মুসলমানরা যাতে নিজেদের মধ্যে ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করতে পারে, সেজন্য এই নিয়ম নাযিল করা হয়েছে। যা-হোক, এ পরীক্ষা বা যাচাই-বাছাই করার পর আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> যদি তোমরা জানো, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। [১]

এই নারীরা যখন ঈমান গ্রহণ করেছে এবং হিজরত করে 'দারুল ইসলামে' চলেই এসেছে; সুতরাং, এই নারীরা তাদের কাফের স্বামীদের জন্য বৈধ নয় এবং সেই কাফেররাও মুহাজির নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফেররা এই নারীদের জন্য যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে দিয়ে দাও। কারণ, এখন এই নারীরা মুসলমান হয়ে গেছে এবং হিজরত করে মুসলিম দেশে চলে এসেছে। আগের কাফের স্বামীদের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং, ইদ্দত শেষ হবার পর তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না। বিবাহের সময় ধার্য করা মোহর আদায় করা আবশ্যক। সুতরাং, এখন যা-ই ধার্য হবে, তা-ই আদায় করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছো, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[২]

আল্লাহ তায়ালার যেকোনো নির্দেশ যথার্থ এবং কল্যাণের ওপর নির্মিত। যখন তিনি এ নির্দেশ দিলেন—কাফের নারীদের সম্ভ্রম নিজেদের কবজায় রেখে দিও না। এতে সুস্পষ্ট হয়ে গেল, কোনো মুসলমানের জন্য তার সেসব স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখা বৈধ নয়, যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি; বরং কাফের অবস্থায়ই বহাল থেকেছে। তাদের উচিত সেসব স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা। পরে তারা যার সঙ্গে ইচ্ছা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে।

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত

ইমাম যুহরি রাহি. বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর উমর রা. তার দুই স্ত্রী— যারা মক্কায় মুশরিক থেকে গিয়েছিল, তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। একজন ছিল উমাইয়্যা ইবনুল মুগিরার মেয়ে কারিবা। যে পরে মক্কায় মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. এর সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। অন্যজন হলেন, আমর বিন জারওয়ালের মেয়ে উম্মে কুলসুম, যিনি পরে আবু জাহম ইবনে হুযাইফার সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তখন উভয়ে অমুসলিম ছিলেন।[১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে থেকে যায়; এরপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করো। আল্লাহকে ভয় করো, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখো।[২]

কারণ, তারা দারুল কুফর (অমুসলিম দেশ) ছেড়ে মুসলিম দেশে হিজরত করে মুসলমানদের কাছে আসতে পারেনি। আগের নির্দেশের আলোকে এটা দুরস্ত ছিল, মুসলমানরা তাদের স্ত্রীদের জন্য যা কিছু ব্যয় করেছিল তা কাফেরদের থেকে চেয়ে নিতে পারবে। যেমন, মুসলমানরা সেই কাফের স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়িত অর্থ ফেরত দিয়েছিল। যা তারা তাদের মুসলমান হয়ে মদিনায় আসা স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছিল। আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখো।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> হে নবি, মুমিন নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে— তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির, ৮/১২
[২] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত, ১১

| প্রার্থনা করুন।[১]

এখানে নবিজিকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন; তাদের যাবতীয় ভুলচুক এবং বাইআতের পর ভুলে তারা যেসব কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিল, সেগুলোর জন্য আপনি তাদের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। মহীয়ান আল্লাহ বলেন,

| নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।[২]

মহান আল্লাহ তায়ালা আপনার ইস্তেগফার ও দুআর বরকতে তাদের ক্ষমা করে দিবেন; তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহে ধন্য করবেন।

নারী-পুরুষ সম্পর্কিত বিশদভাবে আলোচিত উপরিউক্ত বিধিবিধানে মানুষের কল্যাণ ও কামিয়াবি নিহিত রয়েছে। তাই ঈমানদারদের উচিত এসব বিধান অনুযায়ী আমল করা।

মহান আল্লাহর বিধিবিধানের আনুগত্য, তাঁর দ্বীনের ওপর অবিচল থাকা এবং ঈমানের আবেদনের পূর্ণতা নিহিত আছে—একজন মুসলিম আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দুশমনদেরকে এড়িয়ে চলবে। তাদের সাথে দোস্তি ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা মানে আল্লাহর ক্রোধকে ডেকে নিয়ে আসা। সুতরাং, মনে রাখা উচিত—হে ঈমানদাররা, তোমরা কখনো এমন সম্প্রদায়কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, যাদের ওপর আল্লাহর গজব পতিত হয়েছে, যারা আখিরাত সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেছে। তারা আখিরাতের ভাবনাই হৃদয় থেকে বের করে দিয়েছে। যেমন কাফেররা কবরে সমাহিত লোকদের সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেছে। তাদের কোনো আশা নেই, কবরস্থ লোকেরা তাদের কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে। আসলে তারা আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী। মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও পুনরুত্থান সম্পর্কেও তাদের কোনো ধারণা নেই।

উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। আয়িশা রা. নবিজি থেকে মুমিন নারীদের থেকে বাইআত গ্রহণের কথা এভাবে বর্ণনা করতেন—যখন এ আয়াত নাযিল হলো, "হে নবি, মুসলিম নারীরা যখন আপনার কাছে এ মর্মে বাইআত করতে আসে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে

[১] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত, ১২
[২] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত, ১২

শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, অপবাদ রটাবে না এবং কোনো ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না—তখন তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"[১] তখন নবিজি এমন নারীদের পরীক্ষা করলেন এবং তাদের থেকে আয়াতে বর্ণিত বিষয়াদির অঙ্গীকার নিলেন। যে নারী এসব বিষয়ে অঙ্গীকার করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতো, নবিজি তার বাইআত গ্রহণ করে নিতেন। স্রেফ মুখে বলে দিতেন, 'আচ্ছা, আমি তোমার বাইআত গ্রহণ করে নিলাম।' আয়িশা রা. বলেন, ‹আল্লাহর কসম, নবিজির হাতের সঙ্গে কখনো কোনো নারীর হাত স্পর্শ করেনি।›

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি ঈদুল ফিতরের নামাজে নবিজির সঙ্গে ছিলাম। এমনকি আবু বকর, উমর আর উসমান রা. এর শাসনামলও আমি দেখেছি। এরা সবাই আগে ঈদের নামাজ পড়তেন। তারপর খুতবা দিতেন।

নবিজি প্রথমে ঈদের নামাজ পড়িয়ে খুতবা দিতেন। তারপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে যেতেন। একবারের ঘটনা, যেটা ভাবলে এখনো সেই দৃশ্য চোখে ভাসে। উপস্থিত লোকদের মধ্যে যারা উঠে বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল, নবিজি তাদেরকে হাতের ইশারায় বসিয়ে দিচ্ছিলেন। তারপর তিনি পুরুষদের মজলিস ভেদ করে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। যেখানে নারীরা নামাজ পড়েছিল, তিনি সেখানে গিয়ে থামলেন। নবিজির সঙ্গে বিলাল রা.ও ছিলেন। নবিজি সেখানে আলোচ্য আয়াতখানা তিলাওয়াত করলেন। তারপর নারীদের বললেন, ‹তোমরা কি এসব বিষয়ে অবিচল ও অঙ্গীকারবদ্ধ?' এক নারী উত্তর দিল, 'জি ইয়া রাসুলাল্লাহ!' মনে হলো যেন সেই নারীই সবার পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছিল। বাহ্যত সেই কারণেই অন্য কোনো নারী আর কোনো জবাব দেয়নি। সবাই নীরব ছিল। অন্য বর্ণনায় আছে, সেই নারী ছাড়া অন্য কোনো নারী কোনো জবাব দেয়নি।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর রা.-কে বললেন, তুমি ঘোষণা দাও—হে মুসলিম রমণীরা, আল্লাহর রাসুল তোমাদের থেকে এ মর্মে বাইআত গ্রহণ করত চান, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার

[১] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত, ১২

করবে না, অপবাদ দিবে না এবং আল্লাহর রাসুলের নাফরমানি করবে না উপস্থিত নারীদের মধ্যে হিন্দ বিনতে উতবা ইবনে রবিআ রা.ও ছিলেন, যিনি উহুদ অভিযানে হামযা রা. এর শাহাদাতের পর পেট-বুক চিরে কলিজা চিবানোর ইচ্ছা করেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নবিজির ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে লুকিয়ে এক কোণে বসে ছিলেন। উমর ফারুক রা. যখন এ কথা বললেন—অঙ্গীকার করো, চুরিও করব না...তখন হিন্দ বিনতে উতবা রা. বলতে লাগলেন, 'আমি (আমার স্বামী) আবু সুফিয়ান থেকে (তার অগোচরে) কিছু অর্থকড়ি নিই। কারণ, সে কিছুটা কৃপণ প্রকৃতির লোক (তাই পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আমাকে তার অগোচরে কিছু অর্থকড়ি সরিয়ে নিতে হয়)।' সেখানে তার স্বামী আবু সুফিয়ান রা.ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, ‹হিন্দ, আজ পর্যন্ত তুমি আমার অগোচরে যে অর্থকড়ি সরিয়ে নিয়েছো এবং ভবিষ্যতে যা সরিয়ে নিবে, তা সবই তোমর জন্য হালাল।' এরপর উমর ফারুক রা. যখন এ কথা বললেন— তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না... তখন তিনি বলে উঠলেন, 'আমরা তো তাদেরকে বদর যুদ্ধে মেরে ফেলছি' এ কথা শুনে উমর ফারুক রা. হাসিতে ফেটে পড়লেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, কয়েকজন নারী বলে উঠল, ‹আমরা তো আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করি না; তাদের বাবা তাদেরকে হত্যা করে।› আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলতেন, 'এমন কোনো অপবাদ রটাবে না, যা তারা নিজেদের হাত-পায়ের মাঝখান থেকে রচনা করেছে' এ আয়াতে যে অপবাদের কথা বর্ণিত হয়েছে, তাতে এটিও শামিল, কোনো স্ত্রী অন্য লোকের সন্তানকে নিজের স্বামীর সন্তানরূপে প্রকাশ করে এবং তার বংশভুক্ত করে দেয়। এমন জঘন্য অপবাদের রীতি জাহেলি যুগে প্রচলিত ছিল।

"তেমনিভাবে ব্যভিচারের ফলে যে গর্ভসঞ্চার হয়, তাকে স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দেওয়াও অপবাদের শামিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'হাত-পায়ের মাঝখান থেকে অপবাদ রচনা করা' কথাটি একটি আরবি বাগধারা। এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

১. স্বেচ্ছায় বা সজ্ঞানে কারো ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

২. অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে নিজ স্বামীর সন্তান বলে পরিচয় দেওয়া।

জাহেলি যুগে কোনো কোনো নারী অন্যের সন্তানকে নিয়ে এসে বলত—এ সন্তান আমার স্বামীর। অথবা ব্যভিচার করত এবং তাতে যে অবৈধ সন্তানের জন্ম হতো, তাকে নিজ স্বামীর সন্তান বলে পরিচয় দিত। আলোচ্য আয়াতে এই ঘৃণ্য অপরাধ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি নেওয়া বোঝানো হয়েছে।"[১]

হিজরতের আগে মিনা প্রান্তরে নবিজি মদিনার আনসার সাহাবিদের থেকে যখন বাইআত গ্রহণ করেছিলেন, সেই বাইআত অনুষ্ঠানেও তিনি একই বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। উবাদা ইবনু সামিত রা. বলেন, নবিজি আমাদের থেকে অনুরূপ অঙ্গীকার নিলেন, যেরূপ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন নারীদের থেকে; যেন আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি, চুরি না করি, ব্যভিচার না করি, আমাদের সন্তানদের হত্যা না করি এবং একে-অন্যের ক্ষতি না করি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

> "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা পূর্ণ করবে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে পাবে। আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন কোনো অপরাধ করে যার (হদ্দ) শরিয়তের শাস্তি অবধারিত হয়, এরপর তার ওপর সে শাস্তি যদি কার্যকর হয়, তবে তা তার অপরাধের কাফফারা হয়ে যাবে। যে ব্যক্তির পাপ কাজ আল্লাহ গোপন রাখলেন, তার বিষয় আল্লাহর ইচ্ছাধীন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তাকে শাস্তি দিবেন। আর যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।"[২]

সূরা মুমতাহিনার আয়াত ১০-১১ নং এ হিজরত সংক্রান্ত আরেকটি বিধান জারি হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন যদি মুসলমান হয়ে হিজরত করে দারুল ইসলামে (মুসলিম দেশে) চলে আসে, আর অন্যজন কুফরি নিয়ে থাকে (অর্থাৎ কাফেরই থেকে যায়) এবং মুসলিম দেশে হিজরত না করে—তখন দেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল থাকবে না। এমন পরিস্থিতিতে যদি কোনো কাফেরের স্ত্রী মুসলমান হয়ে মুসলিম দেশে চলে আসে, তখন যে মুসলমান পুরুষ তাকে বিবাহ করবে তার ওপর কিছু দায়িত্ব অর্পিত হবে। যেমন, এই মুসলমান নারীকে আগের কাফের স্বামী যে মোহর দিয়েছিল, সেটা বর্তমান স্বামী প্রাক্তন

[১] তাফসিরে তাওযিহুল কুরআন
[২] মুসলিম, হাদিস, ৪৩৫৫

স্বামীকে ফেরত দিবে। বিপরীতে, যদি কোনো মুসলমান পুরুষের স্ত্রী কাফের হয়ে যায় এবং হিজরত করে মুসলিম দেশে আগমন না করে তবে তার বিধান কী? এ কথা কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যদি তোমাদের হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে চলে যায়...'; আয়াতে 'কাফেরদের কাছে চলে যায়' এর মর্মার্থ হলো, কাফের দেশে থেকে যায়। কারণ, আল্লাহ না করুন, কোনো মুসলমান পুরুষের স্ত্রী কাফেরদের কাছে চলে যায়নি। এমন ঘটনা ঘটা সম্ভব ছিল না এবং বাস্তবেও তা ঘটেনি। ইতিহাস তার সাক্ষী। যদিও কোনো কোনো তাফসিরকারক নিছক শব্দের বিস্তৃতি হিসেবে এ অর্থ বর্ণনা করেছেন, যদি কোনো মুসলমান নারী, (আল্লাহ না করুন) যদি মুরতাদ হয়ে চলে যায়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসিরবিদের মতে এটাই তাফসির, যে নারীরা কাফের দেশে থেকে গিয়েছিল এবং মুসলিম দেশে হিজরত করে আসেনি, তখন তাদের বিধান ছিল— কোনো কাফের পুরুষ যদি এমন নারীকে বিয়ে করতে চায়, তবে তার দায়িত্ব হলো আগের স্বামীর আদায়কৃত মোহর ফেরত দেওয়া।

এ বিধান নাযিলের পর, ইসলাম গ্রহণ করে যে নারীরা হিজরত করে মুসলিম দেশে এসেছিল, বর্তমান মুসলিম স্বামীরা তাদের আগের স্বামীকে তার আদায়কৃত মোহর ফেরত দিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাফেররা রাজি হলো না। তারা কাফের দেশে থেকে যাওয়া নারীদেরকে বিয়ে করে নিল ঠিকই; কিন্তু সেসব নারীর স্বামী, যারা মুসলমান হয়ে মুসলিম দেশে চলে এসেছিল, তাদেরকে তাদের আদায়কৃত মোহর ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানাল। এ পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হলো এবং আগের নির্দেশ রহিত হয়ে গেল। যখন সেসব মুসলমানরা যাদের স্ত্রীরা কাফের দেশে থেকে গিয়েছিল, তাদের কাফের স্বামীদের থেকে নিজেদের আদায়কৃত মোহর আদায় করা যাচ্ছিল না, তখন বলা হয়েছে— মুসলমানদের উচিত কাফের দেশ থেকে হিজরত করে আসা মুসলমান নারীদের (কাফের দেশে থেকে যাওয়া) আগের স্বামীদেরকে কিছু না দেওয়া। তবে কোনো কোনো ফকিহ বলেন, কোনো মুসলমান যদি কাফেরদের ব্যয়িত অর্থ ফেরত দিতে সক্ষম না হয়, তবে মুসলিম দেশের বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে তা আদায় করা হবে। সুবহানাল্লাহ, কী অভিনব ইনসাফ!

জীবন বাঁকে অল্পে তুষ্টি

অল্পে তুষ্টি প্রতিটি মুমিন নারী-পুরুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। অল্পে তুষ্টি মানে হলো আল্লাহ তায়ালা যা দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট থাকে, জীবনের শত দুঃখ-কষ্ট ও অপূর্ণতায় তার কোনো রকমের মন খারাপ বা আক্ষেপ থাকে না। অধিক চাহিদা, বিলাসিতা, অন্যের সম্পদ ভোগের বাসনা, না পাওয়ার হাহাকার—একজন মুমিনের জন্য কখনো কল্যাণকর নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٤

> প্রাচুর্যের লোভ-লালসা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। এমনকি (এভাবে) তোমরা কবরে পৌঁছে যাও। এটা কখনোই উচিত নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। অতঃপর এটা কখনোই উচিত নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।[১]

ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি করার প্রতিযোগিতা; এসবের জন্য অহংকার করা এবং আখিরাত থেকে বিমুখ হয়ে দুনিয়ার ভালোবাসা—তোমাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে ব্যতিব্যস্ত ও মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। অবশেষে তোমরা মৃত্যুবরণ করে কবরের দিকে এগিয়ে চলেছো। যে জিনিস চিরস্থায়ী থাকবে সেটা বাদ দিয়ে যা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তার জন্য তোমাদের এভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে কাজ করা মোটেও সমুচিত নয়।

যখন তোমরা করবে প্রবেশ করবে তখন আখিরাত থেকে বিমুখ হয়ে দুনিয়া নিয়ে

[১] সূরা তাকাসুর, আয়াত, ১-৪

ব্যতিব্যস্ত হওয়ার ত্রুটি জানতে পারবে। যদি সত্যিই তোমরা আখিরাত বিমুখ হয়ে ধনসম্পদ ও প্রাচুর্য বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার পরিণতি সম্পর্কে জানতে, তাহলে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি বৃদ্ধির মাধ্যমে গর্ব-অহংকার করতে না। এমনকি এসব কিছু তোমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য এবং আখিরাতের জন্য আমল করা থেকে বিরত রাখত না। অবশ্যই তোমরা জাহান্নামের আগুনের মুখোমুখি হবে। যে নিয়ামত উপভোগ করেছো সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে জিজ্ঞাসিত হবে—আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সেগুলোকে তাঁর আনুগত্যে নিযুক্ত করেছো কি না?

আমার ভাই ও বোনেরা, আমাদেরকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি এবং দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়া থেকে সতর্ক হওয়া উচিত। বিশেষ করে নারী জাতি। তারা সবসময় আরামপ্রিয় হয়ে থাকে। তারা বিলাসিতা ভালোবাসে। সম্পদ যত বাড়ে, তাদের স্বপ্নও তত বিশাল হয়। স্বামীর বাড়ি একটা থাকলে ভাবে আরেকটা হলে ভালো হতো, গাড়ি একটা থাকলে ভাবে আরো দুটো হলে ভালো হতো। এভাবে দৈনন্দিন জীবনে ধনসম্পদ যত বৃদ্ধি পায়, তাদের আকাঙ্ক্ষা আরো বড় হতে থাকে। যদি কোনোভাবে অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয় তবে তাদের না শোকরি আর স্বামীর ব্যাপারে শেকায়েতের কমতি থাকে না। আবার এরাই যদি অল্পে তুষ্টতার স্বাদ আস্বাদন করে, তবে সুখে শোকর আদায় এবং দুঃখ-কষ্টেও শেকায়েত থাকবে না। বরং তখন তাদের এসবে কিছুই যাবে-আসবে না।

আমাদের উচিত আখিরাতের জন্য এই দুনিয়াকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা। মৃত্যুর আগে সম্পদকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয় আসার পূর্বে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করো। বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে তোমার ধনাঢ্যতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসর সময়কে এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে।"[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

[১] হাদিসটি হাকিম এবং বাইহাকি তাদের শুয়াবুল ঈমানে ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন; হাদিসটি সহিহ

> প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছে যাও। বান্দা বলে—আমার মাল, আমার সম্পদ। (হে মানুষ), তোমার মাল তো তা, যা তুমি খেয়ে শেষ করেছো, কিংবা যা তুমি পরে পুরাতন করে ফেলেছো, অথবা যা তুমি সাদাকা করে কার্যকর করেছো।[১]

বিলাসিতা ও অতিভোগে কখনো শান্তি-স্বস্তি মেলে না। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসী জীবন মুমিনের অন্তর থেকে আল্লাহভীতি দূর করে দেয়। সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঈমান ও আমলে ত্রুটি দেখা দেয়। আমলে তৃপ্তি আসে না। কাজেই অল্প তুষ্টিতেই মুমিনের কল্যাণ। এ ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, যাকে প্রয়োজনমাফিক রিযিক দান করা হয়েছে এবং যে তাতেই পরিতুষ্ট থাকে, সেই সফলকাম।"[২]

এছাড়া আল কুরআনে নবি-পত্নীদেরকে বিশেষ সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ۝٤

> (হে নবি-পত্নীরা), তোমরা যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো (তবে সেটাই হবে উচিত কাজ), কেননা তোমাদের অন্তর ঝুঁকে পড়েছে।[৩]

আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'আমি অনেক দিন পর্যন্ত এ চিন্তায় বিভোর ছিলাম। আমি উমর ফারুক রা.-কে জিজ্ঞেস করতে চাইতাম—নবিজির স্ত্রীদের মধ্যে এ দুজন কারা, যাদেরকে এ আয়াতে বিশেষভাবে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'তোমরা দুজন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো, তবে তা

[১] নাসায়ি, ৩৬১৩
[২] ইবনে মাজাহ, হাদিস, ৪১৩৮
[৩] সূরা তাহরিম, আয়াত, ৪

তোমাদের জন্য উত্তম। কারণ, তোমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হয়েছে।' তো একবার উমর রা. হজে যাচ্ছিলেন। আমিও তার সফরসঙ্গী হলাম (কিন্তু জিজ্ঞেস করার মতো মনোবল ছিল না)। একদিন তিনি এক মঞ্জিলে অবস্থান করছিলেন। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে তিনি বাইরে কোথাও গেলেন। একটু পর ফিরে আসলেন। তারপর ওযু করতে লাগলেন। আমি পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। এক ফাঁকে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‹আমিরুল মুমিনিন, এই আয়াতে কোনো দুইজন নারীর কথা বলা হয়েছে?‘ আমি এ কথা উচ্চারণ করতে না করতেই তিনি বলে উঠলেন, ‹তাজ্জবের কথা ভাতিজা! (এ সম্পর্কে তোমার এখনো জানা নেই!) এরা তো আয়িশা আর হাফসা।' এ কথা বলে তিনি বিশদ বর্ণনা দিতে লাগলেন—'আমরা কুরাইশি পুরুষরা নারীদের ওপর প্রাধান্য বজায় রেখে চলতাম। মদিনায় হিজরত করে দেখি, এখানকার নারীরা পুরুষের ওপর দাপট দেখিয়ে চলে। আমাদের মুহাজির নারীরাও মদিনা এসে তাদের আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তো আমার বাড়িটি ছিল আওয়ালি মদিনা এলাকায় উমাইয়্যাহ বিন যায়েদের বাড়িতে। একদিন আমি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কেনো বিষয়ে একটু নাখোশ হলাম। রেগে গিয়ে সামান্য কটু কথা বললাম। হঠাৎ দেখি সে আমার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল! আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। আমি বললাম, 'তুমি আমার মুখের ওপর জবাব দিচ্ছো?' এতে সে বলতে লাগল, 'উমর, তুমি কি আমার এ আচরণে বিস্মিত হচ্ছো? আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসুলের স্ত্রীরা তো রীতিমতো তাঁর কাছে বিভিন্ন দাবিদাওয়া চাচ্ছে। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে গড়িয়েছে যে, তিনি তাদের প্রতি নারাজ হয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলাদা হয়ে অবস্থান করছেন।' এ কথা শুনেই আমি হাফসার কাছে দ্রুত পৌঁছালাম। বললাম, 'তোমরা কি নবিজির সঙ্গে আড়ি দিচ্ছো?' সে বলল, 'হ্যাঁ, এমনই কিছু ঘটেছে।'আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসুল কি তোমাদের প্রতি নাখোশ হয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলাদা অবস্থান করছেন?' জবাবে সে বলল, 'হ্যাঁ। এমনটাই ঘটেছে।' এরপর বললাম, 'তোমাদের মধ্যে যারা এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত নিশ্চিতভাবে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা নারাজ হবেন না, এ ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিন্ত? তোমরা যেহেতু তাঁর রাসুলকে রাগিয়েছো, এতে নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি নারাজ হবেন।"

মাসরূক রাহি. ইমাম শাবি থেকে বর্ণনা করেন, নবি-পত্নীরা যখন নবিজির কাছে

বাড়তি ভরণপোষণের দাবি করলেন, তখন তিনি এক মাসের জন্য "ঈলা" (স্ত্রী সম্ভোগের) কসম খেয়েছিলেন। এতে তাকে কাফফারা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। এ নির্দেশ পেয়ে তিনি কসমের কাফফারা আদায় করেছিলেন।[১]

[১] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

বিবাহনামা

একজন নারী যদি একাধিক পুরুষের সাথে যৌথভাবে স্ত্রী হয়, তবে বৈবাহিক অধিকারের কারণে প্রত্যেকেই যৌবিক চাহিদা পূরণের দাবি জানাবে। এতে পুরুষদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও লড়াইয়ের প্রবল আশঙ্কা দেখা দেয়। হতে পারে সকল স্বামীর মধ্যে একই সময়ে চাহিদা তৈরি হলো, তখন ব্যাপারটি হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত গড়াতে পারে। হিন্দুদের কোনো কোনো গোত্রে ধর্মমতে এমনটা বৈধ—পাঁচ ভাই মিলে একজন নারীকে বিবাহ করবে। আত্মমর্যাদা-বোধহীন লোকদের ধর্ম আত্মমর্যাদা-বোধহীনতার কথাই বলে। ইসলামের মতো মর্যাদাসম্পন্ন ধর্ম কিছুতেই এই অনুমতি দেয় না, একজন নারী কিছু সময় এক পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হবে, আর কিছু সময় আরেক পুরুষের।

সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষ কর্তা, নারী তার আজ্ঞাধীন। এ কারণেই তালাকের এখতিয়ার পুরুষকে দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে মুক্ত করে না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী অপর পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। দাস-দাসী যেমন স্বেচ্ছায় মুক্ত হতে পারে না, তেমনি স্ত্রীও স্বেচ্ছায় বিবাহবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। দাস-দাসীর বেলাতে আছে মুক্তিদান, আর স্ত্রীর বেলায় আছে তালাক। তাই পুরুষ যখন কর্তা, এক কর্তার অধীনে একাধিক আজ্ঞাধীন ব্যক্তির থাকা মুক্তির বিচারে সম্ভব। এটা অপমানজনকও নয়, কঠিনও নয়। পক্ষান্তরে, এক ব্যক্তি যদি একাধিক কর্তার অধীন হয়, সেক্ষেত্রে আজ্ঞাধীন একজন, কর্তা অনেকজন। এমন ক্ষেত্রে আজ্ঞাধীন ব্যক্তি অসম্ভব দ্বিধার সম্মুখীন হয়—কার কথা সে পালন করবে। এটা অপমানজনকও বটে। কর্তার সংখ্যা যত বেশি হবে, আজ্ঞাবহের অপমানও তত বেশি হবে।

এ জন্যই ইসলাম ধর্ম একজন নারীকে একাধিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহের অনুমতি দেয়নি। কারণ, এ অবস্থায় নারীর লাঞ্ছনাও বেশি, সমস্যাও মারাত্মক। তাছাড়া একাধিক স্বামীকে সেবা দেওয়া এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়. নারীরা যাতে অসম্মান ও অসহনীয় কষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে এ জন্যই একজন নারীকে একই সময়ে একাধিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়নি। কোনো নারীর যদি একাধিক স্বামী থাকে, এমতাবস্থায় যে সন্তানগুলো জন্ম নিবে, একাধিক স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার কারণে—কে কার সন্তান, তাদের প্রতিপালন কীভাবে হবে, তাদের উত্তরাধিকার সম্পদ কীভাবে বণ্টিত হবে, তারা কি চার স্বামীর যৌথ সন্তান হবে, না বণ্টিত হবে এবং বণ্টন কীভাবে হবে? যদি সন্তান একজন হয় তবে চার পিতার মাঝে কীভাবে বণ্টিত হবে? যদি একাধিক সন্তান হয় এবং সন্তানদেরকে বণ্টন করার প্রয়োজন হয়, তবে পুত্র ও কন্যার তারতম্য, গঠনাকৃতির তারতম্য, সুস্থতা ও দৈহিক শক্তির তারতম্য এবং বোধবুদ্ধি ও যোগ্যতার তারতম্যের কারণে সমতা রক্ষা করা কীভাবে সম্ভব হবে? এত সব ভিন্নতা ও তারতম্যের কারণে সন্তানদের বণ্টনের বিষয়টি মারাত্মক জটিল হয়ে উঠবে। বিভেদ ও বিবাদ থেকে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায় তা কে জানে। আর এ জন্যই নারীকে একই সময়ে একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

অনেক সময় স্ত্রীরা অসুস্থতার কারণে কিংবা বন্ধ্যা হওয়ার কারণে প্রজননের উপযুক্ত থাকে না। অথচ পুরুষদের থাকে বংশরক্ষার সহজাত ঝোঁক। এমতাবস্থায় বিনা কারণে তালাক দিয়ে স্ত্রীকে ভিন্ন করে দেওয়া কিংবা তার ওপর কোনো দোষারোপ করে তালাক দিয়ে দেওয়া—ইউরোপ-আমেরিকায় যেটা প্রতিনিয়ত ঘটে, সেটা ভালো? না কি এটা ভালো যে, তাকে স্ত্রী হিসেবে রেখে এবং তার অধিকার রক্ষা করে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেওয়া হবে; কোনটা ভালো হবে? যদি কোনো জাতি নিজেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আগ্রহী হয় কিংবা সাধারণভাবে বংশবিস্তারের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রাখে, তবে তো এটাই সর্বোত্তম পন্থা, পুরুষরা একাধিক বিবাহ করবে, যাতে বেশি সন্তান লাভ করতে পারে।

নারীদের সংখ্যা সৃষ্টিগতভাবে এবং স্বাভাবিক নিয়মে পুরুষদের চাইতে বেশি। মেয়েসন্তান অপেক্ষা ছেলেসন্তান কম জন্মগ্রহণ করে, আবার মারা যায় বেশি।

লক্ষ লক্ষ পুরুষ যুদ্ধে নিহত হয়। হাজার হাজার পুরুষ সড়ক ও নৌ দুর্ঘটায় মারা যায়। শত-সহস্র পুরুষ খনিতে আটকা পড়ে, মারা যায় বিল্ডিং ধসে বা নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে। বিপরীতে, মেয়েসন্তান জন্ম হয় বেশি, মারা যায় কম। সুতরাং, পুরুষদেরকে যদি একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া না হয়, তবে অতিরিক্ত নারীরা বিবাহ ছাড়াই রয়ে যাবে। কে তাদের অর্থনৈতিক জীবনের দায়ভার গ্রহণ করবে? তাদের ভরণপোষণ ও চিকিৎসার দায়িত্ব কে নিবে? এ নারীরাই বা কীভাবে নিজেদেরকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করবে?

সুতরাং, একাধিক বিবাহের বিধান অসহায় নারীদের অবলম্বন। তাদের পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার একমাত্র ব্যবস্থা। জীবন ও সম্মানের রক্ষাকবচ ও নিরাপত্তাদানকারী। ইসলামের এই অনুগ্রহের শোকর আদায় করা নারীদের ওপর ওয়াজিব। ইসলাম নারীদের জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা করেছে, দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা থেকে বাঁচিয়েছে; সুখ দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, মানুষের অপবাদ ও কুধারণা থেকে নিরাপদ করেছে। পৃথিবীতে যখন কোনো মহাযুদ্ধ শুরু হয় তখন পুরুষরাই বেশি মারা যায়। আর দেশে দেশে বেড়ে যায় অসহায় নারীদের সংখ্যা। তখন দরদি ব্যক্তিদের ইসলামের এ বিধানের প্রতিই দৃষ্টি যায়। এই তো বছর ত্রিশেকের আগের কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি এবং ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র—যাদের ধর্মে একাধিক বিবাহ বৈধ নয়, নারীদের অসহায়ত্ব লক্ষ করে ভেতরে ভেতরে একাধিক বিবাহের বৈধতায় ফতোয়া তৈরি করছিল।

যারা একাধিক বিবাহকে দোষণীয় মনে করে, আমরা তাদের জিজ্ঞেস করি—যখন দেশে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা লক্ষাধিক বেশি, তখন তাদের জন্মগত অধিকার রক্ষা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এবং তাদের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য আপনার কাছে কী সমাধান আছে? আপনি এই অসহায় নারীদের মুসিবত দূর করার জন্য কী আইন প্রণয়ন করেছেন? আফসোস! পশ্চিমারা ইসলামের একাধিক বিবাহের এ বৈধ ব্যবস্থার ওপর ভোগবাদের অপবাদ চাপিয়েছে। অথচ সীমাহীন অবৈধ সম্পর্ক এবং বিবাহ বহির্ভূত নারী মিলনকে ভদ্রসভ্য জ্ঞান করছে। যে ব্যভিচার সকল নবি-রাসুলের শরিয়তে হারাম এবং সকল দার্শনিক ও পণ্ডিতদের দর্শনে নিন্দনীয়, তার খারাবি পশ্চিমা সভ্যতার ধ্বজাধারীদের নজরে আসে না। যে একাধিক বিবাহ সকল নবি-রাসুলের ধর্মে এবং সকল দার্শনিক ও

পণ্ডিতদের নিকট বৈধ ও ভালো, তা-ই তাদের দৃষ্টিতে মন্দ ও দোষণীয়। এই সভ্য জাতির কাছে একাধিক বিবাহ অপরাধ। কিন্তু ব্যভিচার ও অবাধ যৌনাচার অপরাধ নয়।

বুদ্ধিমত্তায় নারীরা পুরুষের অর্ধেক এবং দ্বীনদারিতায়ও তারা অর্ধেক। ফলাফল, একজন নারী একজন পুরুষের এক-চতুর্থাংশ। আর চারটি এক চতুর্থাংশ মিলে হয় পূর্ণ এক। এর দ্বারা বোঝা যায়, একজন পুরুষ সমান চারজন নারী। আল কুরআনে এতিম মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ۝٣

> যদি তোমরা আশঙ্কা করো—ইনসাফ করতে পারবে না এতিম মেয়েদের ক্ষেত্রে; তবে বিয়ে করো যে নারীদেরকে তোমাদের পছন্দ হয়—দুজন, তিনজন, অথবা চারজন। তারপর যদি আশঙ্কা করো—সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে (বিয়ে করো) একজনকেই কিংবা (ক্ষান্ত থাকো) নিজেদের অধিকার ভুক্ত দাসীতে। এটা অধিক নিকটবর্তী—তোমরা জুলুম করবে না।[১]

এ আয়াতে এতিম মেয়েদেরকে বিবাহ করা সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। এতিম মেয়েরা কারো তত্ত্বাবধানে থাকলে সাধারণত দুরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

১. এতিম মেয়ে রূপবতী ও সম্পদশালী। অভিভাবক ও তত্ত্বাবধানকারীর কাছে তার সম্পদ ও সৌন্দর্য উভয়টিই আকর্ষণীয় হয়। অভিভাবক বা তত্ত্বাবধানকারী সম্পদ ও সৌন্দর্যের লিপ্সায় তাকে যৎসামন্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করে নেয়। যেহেতু এতিম মেয়ের অধিকার রক্ষা করবে এবং তার অধিকার আদায়ে জোর খাটাবে এমন অভিভাবক থাকে না, তাই তত্ত্বাবধানকারী তাকে মোহরানাও কম দেয় এবং তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্ত্রী হিসেবে তার প্রাপ্য অন্যান্য অধিকারও পুরোপুরি আদায় করে না।

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত, ৩

২. এতিম মেয়ে রূপবতী নয়, কিন্তু সম্পদশালী। অভিভাবক বা তত্ত্বাবধানকারী মনে করে, যদি তাকে অন্য কারো সঙ্গে বিবাহ দেই, তার অর্থসম্পদ আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং আমার সম্পদে অন্য ব্যক্তি অংশীদার হবে।

'ইয়াতিম' আরবি শব্দ, যার অর্থ নিঃসঙ্গ। কোনো ঝিনুকের মধ্যে যদি একটিমাত্র মুক্তো জন্ম নেয়, তখন একে 'দূরের এতিম' বা নিঃসঙ্গ মুক্তা বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় যে শিশুসন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে এতিম বলা হয়। অবশ্য জীবজন্তুর ব্যাপারে এর বিপরীতভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, যেসব জীবজন্তুর মা মারা যায়, সেগুলোকে এতিম বলা হয়।

ছেলেমেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামি পরিভাষায় এতিম বলা হয় না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> বালেগ হবার পর আর কেউ এতিম থাকে না।[১]

কোনো এতিম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসেবে কিছু সম্পদ লাভ করে, তাহলে তার অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সেসব মালেরও হেফাজত করা। এতিমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যেই অভিভাবককে মনোনীত করুক না কেন, তার ওপরই এতিমের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। সেই অভিভাবকের উচিত, এতিমের যাবতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধনসম্পদ থেকে নির্বাহ করা। যতক্ষণ পর্যন্ত এতিম বালেগ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে তার সম্পত্তি অর্পণ না করা। কারণ, বালেগ হওয়ার আগে তার বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত না হওয়াই স্বাভাবিক।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, এতিমের ধনসম্পদ তার কাছে পৌঁছে দাও। এর অর্থ হচ্ছে, সে বালেগ হলেই কেবল তার কাছে গচ্ছিত মালামাল পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং, এতিমের মালামাল তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার পন্থা হলো—তার মালামাল পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা এবং বালেগ হলে যথা সময়ে তার কাছে তার সম্পত্তি হস্তান্তর করা। কোন অভিভাবক ব্যক্তিগতভাবে এতিমের মাল অপচয় ও আত্মসাৎ করবে না। এটাই যথেষ্ট নয়, বরং তার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এতিমের ধনসম্পদের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা। এতিম বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তার

[১] মেশকাত, পৃ: ২৮৪

নিজস্ব দায়িত্বে তা সংরক্ষণ করা।

জাহেলি যুগে এতিম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করা হতো। যদি কোনো অভিভাবকের অধীনে কোনো এতিম মেয়ে থাকত আর সে যদি সুন্দরী হতো এবং উপরি হিসেবে তার কিছু সম্পদও থাকত—তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মোহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিত। অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ফিকির করত। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার কিংবা সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করত না কখনো।

আয়িশা রা. বলেন, নবিজির যুগে ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি এতিম মেয়ে ছিল। সেই ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে এতিম মেয়েটারও অংশ ছিল। একসময় সেই ব্যক্তি এতিম মেয়েটিকে বিয়ে করে নিল। নিজের পক্ষ থেকে দেনমোহর তো আদায় করলই না, উলটো বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিল।

অভিভাবক বা তত্ত্বাবধানকারীদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে—যদি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করো তবে তো বটেই, আর যদি সামান্য আশঙ্কাও করো যে, তোমরা এতিম মেয়েদের থেকে ইনসাফ রক্ষা করতে পারবে না, তাদের মোহরানা এবং তাদের সাথে সদাচরণে তোমাদের থেকে ত্রুটি হবে; তাহলে সেই এতিম মেয়েদেরকে তোমাদের বিয়ে করার অনুমতি নেই। বরং তাদের ছাড়া অন্য নারীদেরকে বিবাহ করো যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয়; একটিই নয়, দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত তোমাদের জন্য অনুমতি আছে। তবে চারের অধিক অনুমতি নেই। এটা অনমুতির শেষসীমা।

মানে হলো, যদি তোমরা আশঙ্কা করো, এতিম মেয়েদেরকে বিবাহ করলে তাদের সঙ্গে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না, তবে তাদেরকে বিবাহই করো না। তাদের ছাড়া অন্য নারীদেরকে বিবাহ করো, যাদেরকে তোমাদের ভালো লাগে। নারীর তো অভাব নেই। আল্লাহর পক্ষ হতেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তোমাদের জন্য একজন থেকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি আছে। যখন তোমরা বাধ্য নও এবং তোমাদের প্রয়োজনও এতিম মেয়েদের সঙ্গে আটকে নেই, তখন অপ্রয়োজনে কেন কারো হক নষ্টে লিপ্ত হবে?

তারপর যদি তোমরা আশঙ্কা করো, একাধিক নারীর মাঝে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে বিয়ে করেই তুষ্ট থাকো। কিংবা দাসীতে ক্ষান্ত থাকো, যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত সম্পদ। এটা তোমাদের জন্য সহজ। কারণ দাসীদের অধিকার স্বাধীন নারীদের সমান নয়। এ নির্দেশ ঐ কথার অধিক নিকটতর, তোমরা অবিচার করো না এবং কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ করো না। কারণ, স্ত্রী যদি একজনই হয় তবে তোমরা তার প্রতিই আগ্রহী থাকবে এবং তার অধিকার আদায় করা তোমাদের জন্য সহজ হবে। আর যদি শুধু দাসী হয়, তবে তাদের অধিকার স্বাধীন নারীদের সমান নয়। তাই তাদের অধিকার রক্ষা করা তেমন কঠিন হবে না।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত, পুরুষের জন্য একই সাথে নিজ বিবাহে চারজনের অধিক নারীকে একত্রে বিয়ে করা জায়েজ নয়। জাহেলি যুগে স্ত্রীদের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। একজন পুরুষের আট-দশজন করে স্ত্রী থাকত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, একসাথে চারের অধিক নারীকে বিবাহবন্ধনে রাখা জায়েজ নয়। সহিহ হাদিস দ্বারাও এটা প্রমাণিত।

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, "লোকেরা তোমার কাছে নারীদের সম্বন্ধে বিধান জানতে চাচ্ছে। বলে দাও, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদের বিধান জানিয়ে দিচ্ছেন...[১]। এ আয়াত হচ্ছে এতিম বালিকাদের সম্পর্কে, যারা কোনো অভিভাবকদের অধীনে আছে এবং তারা ঐ অভিভাবকদের ধনসম্পদেও অংশীদার। অথচ তারা নিজেরা তাদের বিয়ে করতে ইচ্ছুক নয় এবং অন্য কেউ তাদেরকে বিয়ে করুক এবং ধনসম্পদে ভাগ বসাক তাও তারা পছন্দ করে না। তাই তারা তাদের বিয়েতে বাধার সৃষ্টি করে। তাই, আল্লাহ তায়ালা এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَـٰبِ فِي يَتَـٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَـٰمَىٰ

[১] সূরা নিসা, আয়াত, ১২৭

بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

> তারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অনুমতি দেন এবং কুরআনে তোমাদেরকে যা যা পাঠ করে শোনানো হয়, তা ঐ সব পিতৃহীনা-নারীদের বিধান, যাদেরকে তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান করো না, অথচ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখো। আর অক্ষম শিশুদের বিধান এই—এতিমদের জন্যে ইনসাফের ওপর কায়েম থাকো। তোমরা যা ভালো কাজ করবে, তা আল্লাহ্ জানেন।[১]

নারীদেরকে বিবাহ করার অনুমতি ও বৈধতাদান আল্লাহ তায়ালার বড় অনুগ্রহ। তাই যদি একসাথে চারের অধিক স্ত্রী রাখা বৈধ হতো, তবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন।

ইমাম শাফেয়ি রাহি. বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্যকে নবিজির সুন্নাহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছে—নবিজি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য একই সাথে নিজ বিবাহে চারজনের অধিক নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

জ্ঞানীরা সামান্য চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, যদি সাধারণ অনুমতি উদ্দেশ্য হতো তবে শুধু (فانكحوا) বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। চার পর্যন্ত সীমা নির্ধারণের কোনো প্রয়োজন ছিল না। আহলুস সুন্নাহ বলেন, فانكحوا দ্বারা জগতের সকল পুরুষকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং ما طاب لكم من النساء দ্বারা জগতের সকল নারীকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের মর্মার্থ হলো—দুনিয়ার পুরুষেরা, এসকল নারীকে আমি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি। তোমরা তাদেরকে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীরূপে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নাও। তবে এ অনুমতি ও বৈধতার জন্য শর্ত হলো, এ বণ্টন দুই, তিন এবং চার সংখ্যার প্রতি লক্ষ রাখবে।

ইসলামের সকল বিধান অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ; অতিরঞ্জন ও শৈথিল্যমুক্ত। ইসলাম খ্রিষ্টান পাদরি, হিন্দু যোগী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতো সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেয় না; শ্রেফ এক নারীতে তুষ্ট থাকাকেও আবশ্যিক সাব্যস্ত করে না। বরং প্রয়োজন অনুসারে এক থেকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়।

[১] প্রাগুক্ত

খ্রিষ্টান পাদরিরাও গভীর চিন্তাভাবনার পর এ ফতোয়াই প্রদান করেন। ১৮৭১ সনে আমেরিকান মিশন প্রেস প্রকাশিত ভুল সংশোধন গ্রন্থে আছে, "একাধিক বিবাহের প্রথা বনি ইসরাইলে ছিল। ঈশ্বর তা নিষেধ করেননি বরং বরকতের ওয়াদা করেছেন। লুথার ফিলিপকে দুজোড়া নারীকে বিবাহের অনুমতি দিয়েছেলেন।[১]

বিশ্বের ইতিহাসে এটা স্বীকৃত, ইসলামের আগে সারা পৃথিবীতেই পুরুষের জন্য একাধিক নারীকে একত্রে নিজ বিবাহে রাখার প্রচলন ছিল। এমনকি নবিরাও এ প্রথার ব্যতিক্রম ছিলেন না। ইবরাহিম আ. এর দুজন স্ত্রী ছিলেন—সারা ও হাজেরা আ.। ইসহাক আ. এরও একাধিক স্ত্রী ছিল। মুসা আ. এরও কয়েকজন স্ত্রী ছিল। সুলায়মান আ. এর বিশের অধিক স্ত্রী ছিল। দাউদ আ. এর ছিল একশত স্ত্রী। তাওরাত, ইনজিল এবং অন্যান্য নবিদের সহিফায় তাদের একাধিক স্ত্রীর কথা বর্ণিত আছে। কোথাও তার নিষেধাজ্ঞার সামান্য ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। একমাত্র ইয়াহইয়া ও ঈসা আ. এমন নবি ছিলেন যারা বিবাহ করেননি। তাদের কাজকে যদি দলিলরূপে পেশ করা হয় তবে একজন নারীকে বিবাহ করাও নিষিদ্ধ হবে। হাদিসে আছে, ঈসা আ. কিয়ামতের আগে আসমান থেকে অবতরণ করবেন। তখন তিনি বিবাহ করবেন। তার সন্তানসন্ততিও হবে।

ইহুদি ও খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক বিবাহের ওপর আপত্তি উত্থাপনের কোনো অধিকার নেই। কেবল একজন স্ত্রী রাখার বিধান কোনো ধর্মেই নেই। হিন্দু শাস্ত্রেও নেই, তাওরাত ও ইঞ্জিলেও নেই। শুধু ইউরোপ ও আমেরিকায় এক স্ত্রী রাখার প্রথা প্রচলিত আছে। এ প্রথা কীসের ভিত্তিতে চালু হয়েছে তা জানা নেই। ইউরোপ ও আমেরিকায় যখন থেকে এ প্রথা চালু হয়, তখন থেকে পশ্চিমা জাতিগুলোতে ব্যভিচারের মাত্রা এত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যে, তাদের বিপুল সংখ্যক লোকেরই পিতৃপরিচয় পাওয়া যায় না। যে জাতি একাধিক বিবাহকে খারাপ মনে করেছে, অধিকাংশ তারাই ব্যভিচারে লিপ্ত আছে।

ইসলামের আগে পৃথিবীর সকল দেশ ও অঞ্চলে একাধিক বিবাহের প্রথা সগৌরবে প্রচলিত ছিল। অনেক সময় কোনো কোনো পুরুষ একশত জন নারীকে পর্যন্ত বিবাহ করত। ইসলাম আগমনের পর একাধিক বিবাহকে বৈধ সাব্যস্ত করে, তবে

[১] তাফসিরে হক্কানি, খ. ৩, পৃষ্ঠা: ১৬৬

তার একটি সীমাও বেঁধে দেয়। ইসলাম একাধিক বিবাহকে ওয়াজিব ও আবশ্যিক সাব্যস্ত করেনি এবং ইনসাফ ও সুবিচারের শর্তে অনুমতি দিয়েছে—তোমাদের জন্য একসাথে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি আছে। এ চারের সীমা অতিক্রম করার অনুমতি নেই। কারণ, বিবাহের উদ্দেশ্য হলো—পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষা করা। প্রতি তিন রাত পর স্বামী চার স্ত্রীর একজনের কাছে আসবে তখন স্ত্রীর অধিকার খর্ব হবে না।

বালেগ হওয়ার আগে, শৈশবেই এতিম মেয়েকে তার অভিভাবক বিবাহ দেওয়ার অধিকার রাখে। তবে তার ভালোমন্দ ও ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই তা করতে হবে। এমন যেন না হয়, বয়সের মিল না দেখেই বয়সে ছোট এমন ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিল কিংবা ছেলের স্বভাবচরিত্র, শিক্ষাদীক্ষা এবং আর্থিক সঙ্গতির খোঁজখবর না করেই বিবাহ দিয়ে দিল।

যে বালেগ মেয়েদের বাবা মারা গিয়েছে এবং বালেগ হওয়ার কারণে নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে, কিন্তু লজ্জার কারণে বলতে পারে না; যেহেতু বালেগ হওয়া সত্ত্বেও মেয়েরা মুখ ফুটে নিজের বিবাহের কথা বলে না, অভিভাবক বা আত্মীয় যেখানে বিবাহ দেয় তাই মেনে নেয়, এজন্য অভিভাবকদের অবশ্য কর্তব্য হলো তারা যেন এতিমদের অধিকার হরণ না করে।

এতিম মেয়েদের বৈবাহিক অধিকারের প্রতি সমতা দৃষ্টি রাখা জরুরি। তবে সাধারণ রাষ্ট্রীয় আইনের মতো তা কার্যকর করার দায়িত্ব সরাসরি রাষ্ট্রকে না দিয়ে খোদ জনসাধারণকে আল্লাহর ভয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—যদি তোমরা অবিচারের আশঙ্কা করো, তবে এতিম মেয়েদেরকে বিবাহ করার চিন্তা বাদ দাও; এদের ছাড়া বহু মেয়ে আছে, তাদের কাউকে বিবাহ করো। সরকারের দায়িত্ব হলো এর তত্ত্বাবধান করা এবং কোথাও কাউকে অধিকার বঞ্চিত হতে দেখলে আইনবলে তা প্রতিহত করা।[১]

[১] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

জুলুমের কোন্দরে নারী আর নয়

জাহেলি যুগে একটি প্রথা ছিল। যখন কোনো ব্যক্তি স্ত্রী রেখে মারা যেত, তখন সেই স্ত্রীর সৎপুত্র অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির অপর স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান কিংবা অন্য কোনো ওয়ারিশ এসে ওই বিধবা নারীর ওপর কোনো চাদর বা কাপড় ফেলে দিত। এরপর বলত, আমি যেমন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ওয়ারিশ, তেমন তার বিধবারও ওয়ারিশ। তারপর সে চাইত, মোহরানা ছাড়াই ঐ বিধবা মহিলাকে বিবাহ করতে। কিংবা অন্য কারো সঙ্গে বিবাহ দিতে, আর তার মোহরানা সে নিজে হাতিয়ে নিতে চাইত। কিংবা সে তাকে এমনিই রেখে দিত। নিজেও বিবাহ করত না এবং অন্যের সঙ্গেও বিবাহ দিত না। যাতে সেই সম্পদশালী বিধবা মারা গেলে তার সব সম্পদ সে কুক্ষিগত করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা এ সকল অন্যায় কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি কুরআনে বলেছেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

হে ঈমানদাররা, জোর খাটিয়ে নারীদের ওয়ারিশ হওয়া তোমাদের জন্য হালাল নয়। তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছো তার কিছু অংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোনো প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে (তবে ভিন্ন কথা)! নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। আর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ অভূত

| কল্যাণ রেখেছেন।।[১]

জাহেলি যুগে নারীদের ওপর স্বামীরা যেমন অত্যাচার করত, তেমনি ওয়ারিশদের পক্ষ থেকেও নারীরা অত্যাচারিত হতো। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন—হে মুমিনরা, তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয়, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের প্রাণ ও সহায়সম্পত্তির ওয়ারিশ বনে যাবে। অর্থাৎ, তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয়, তোমরা মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি মনে তার উত্তরাধিকারী বনে যাবে এবং জোরপূর্বক তাকে বিবাহ করবে কিংবা অন্য কারো সঙ্গে বিবাহ দিবে আর তার মোহরানা নিজে গ্রাস করবে। কিংবা তাকে বিবাহ থেকে বিরত রাখবে, যাতে সে মারা গেলে তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারো।

স্ত্রীদেরকে যা কিছু দিয়েছো, তা হতে কিছু অংশ ফেরত নেওয়ার জন্য তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না। অর্থাৎ, তোমাদের জন্য এ অনুমতি নেই, স্ত্রীদেরকে আপন বিবাহে রেখে এমনভাবে অবরুদ্ধ করে রাখবে, যাতে তারা খুলআ-তালাক নিতে বাধ্য হয়। যে তালাক স্ত্রীর ইচ্ছায় সাধারণত অর্থের বিনিময়ে দেওয়া হয়, তাকে খুলআ-তালাক বলে। অর্থের পরিমাণ অবশ্য স্বামীর প্রদানকৃত মোহরানার চেয়ে বেশি হয় না। আর এর পিছনে তোমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাদেরকে যে মোহরানা প্রদান করেছো তা খুলআ-তালাকের বাহানায় ফেরত নিয়ে নিবে। কিন্তু স্ত্রীরা যদি প্রকাশ্য অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, যেমন ব্যভিচার করে, গালাগালি করে কিংবা অবাধ্যতা করে—তবে এমন অবস্থায় তোমাদের এ অধিকার রয়েছে, তাদেরকে খুলআ-তালাক এবং মোহরানা ফেরত দানে বাধ্য করতে পারো। যেমনটি সূরা বাকারায় এসেছে,

> ব্যভিচার, গালিগালাজ এবং স্বামীর স্পষ্ট অবাধ্যতা করলে স্ত্রীকে বাধ্য করে মোহরানা ফেরত নেওয়াতে কোনো গুনাহ নেই।[২]

আজকাল অনেক নারীকে অবাধ মেলামেশা ও যৌনাচার করতে দেখা যায়। তাদেরকে খুলআ-তালাকে বাধ্য করা শুধু জায়েজই নয় বরং আল্লাহর কাছে ওয়াজিব হবে বলেই মনে হয়। যখন স্ত্রীর অবাধ মেলামেশার কারণে সন্তানসন্ততির

[১] সূরা নিসা, আয়াত, ১৯
[২] সূরা বাকারা, আয়াত, ২২৯

বংশ সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি হয় তখন আর বিবাহের কী ফায়দা হলো!

অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রী সুন্দরী হয় না। সেক্ষেত্রে স্বামীরা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার জন্য উদ্যত হয়। স্ত্রী সুন্দরী না হওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাকে পরিহার স্বামীদের অনুচিত। এক্ষেত্রে তাকে ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছে। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রী সুন্দরী না হলেও তার মাঝে এমন কিছু গুণাবলি থাকে যা স্বামীর মন কাড়তে বাধ্য। এমনও হতে পারে স্বামী স্ত্রীর গুণগুলো দেখে তার প্রেমে পড়েছে। আর তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত অবলম্বনে নিষেধ করে ধৈর্যধারণ ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। যাতে করে স্ত্রী তার সেসব গুণাবলিগুলো প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

স্বামীদেরকে স্ত্রীদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, স্ত্রীদের সঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন করো এবং তাদের ভরণপোষণের যথাযথ ব্যবস্থা করো। যদি স্ত্রী একাধিক হয় তবে ইনসাফ রক্ষা করো। যদি কোনো কারণে তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখো। হতে পারে স্ত্রীদের কোনো জিনিস তোমরা অপছন্দ করো, অথচ আল্লাহ তার মাঝে প্রভূত কল্যাণ সৃষ্টি করবেন। অর্থাৎ, যদি তোমরা কোনো কারণে আপন স্ত্রীদেরকে অপছন্দ করো, তবুও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও কোমল আচরণ করা কর্তব্য। হতে পারে তাদের গর্ভ হতে এমন পুণ্যবান সন্তান জন্ম নিবে, যে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের উপকারে আসবে। এর ফলে তোমাদের অপছন্দ ও ঘৃণা, পছন্দ ও ভালোবাসায় বদলে যাবে। কিংবা যদি স্ত্রী দেখতে অসুন্দর হয় কিন্তু আচার-আচরণ ভালো, তবে তার বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখো না, বরং তার গুণ ও চরিত্র মাধুরীর প্রতি লক্ষ করে তার সাথে সদ্ব্যবহার করো।[১]

[১] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

আমলের প্রতিদান; নারী-পুরুষ সমান

ঈমান ও আমলের প্রতিদানের ক্ষেত্রে মহান রবের কাছে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। যে যেমন আমল করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে তেমন প্রতিদান দান করবেন। ঈমান ও আমলের প্রতিদান প্রাপ্তিতে উভয়ের জন্য একই নিয়ম। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের কোথাও এমনটি বলেননি, একই কাজ নারী করলে এক রকম প্রতিদান পাবে আর পুরুষ করলে আরেক রকম প্রতিদান পাবে। বরং আল্লাহ তায়ালার কাছে নারী-পুরুষের আমলের প্রতিদানের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। এই ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

> এরপর তাদের রব তাদের দুআ (এই বলে) কবুল করে নিলেন—আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে— অবশ্যই আমি তাদের ওপর থেকে অকল্যাণকে হটিয়ে দিব। তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে যার

> তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম বিনিময়।[১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের সকল দুআ কবুল করলেন এবং বলে দিলেন, আমার আইন ও বিধান হলো, আমি তোমাদের মধ্যে কারো শ্রম বিনষ্ট করি না। পুরুষ হও বা নারী, তোমরা আপসে এক। কর্মফল বা আমলের প্রতিদানের বেলায় উভয়ে অভিন্ন। সুতরাং, যখন কোনো আমলকারীর ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আমলও বৃথা যায় না, তখন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। যারা সত্যের আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান আনার পর হিজরত করেছে, আল্লাহর জন্য পরিবার, আত্মীয়স্বজন মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে, সহায়সম্পদ বিসর্জন দিয়ে ইসলামের পুণ্যভূমিতে আশ্রয় নিয়েছে এবং শুধু আমার কালেমা পড়ার ও আমার নাম নেওয়ার কারণে নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে আপন ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> কাফেররা রাসুলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে (স্রেফ) এ কারণে—তোমরা তোমাদের রব—আল্লাহকে বিশ্বাস করো।[২]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَمَا نَقَمُواْ مِنۡهُمۡ إِلَّآ أَن يُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ⑧

> কাফেররা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে—তারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিল।[৩]

বর্তমান সমাজে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিদ্বেষীরা ষড়যন্ত্র করে খুব সূক্ষ্মভাবে মানব সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে—ইসলামে নারীদের কোনো মর্যাদা ও অধিকার নেই। ইসলাম সম্পর্কে তারা অজ্ঞ থাকায় মনে করে, ইসলাম কেবল পুরুষদেরই বেশি প্রাধান্য দেয়। অথচ তাদের এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামে উত্তম আখলাক, ঈমান ও আমলের প্রতিদানের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান মর্যাদার অধিকারী।

[১] সূরা আল ইমরান, আয়াত, ১৯৫
[২] সূরা মুমতাহিনা, আয়াত, ১
[৩] সূরা বুরুজ, আয়াত, ৮

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলছেন— এবং আমার পথে তারা নানাভাবে উৎপীড়িত হয়েছে। তারা আমার পথে জিহাদ করেছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে শহীদও হয়েছে। এসব আল্লাহ প্রেমী বান্দাদের, আল্লাহর পথে নিরন্তর কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করা তাদের পূর্ণাঙ্গ ঈমানের দলিল। তাই আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো ও পাপরাশি ক্ষমা করব; তাদেরকে এমন উদ্যানে দাখিল করব যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে। এ প্রতিদান তারা লাভ করবে তাদের রবের পক্ষ হতে।

সন্তান দান কিংবা নিঃসন্তান; সবই রবের এখতিয়ার

এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব একমাত্র মহান রবের। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। আসমান-জমিনের রাজত্ব দুনিয়ার কোনো রাজা-বাদশাহ বা নেতাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তায়ালাই এর মালিক। মানবজাতি চাইলেই যা ইচ্ছা করতে পারে না। তার একটি নিদর্শন হলো—সন্তান গর্ভধারণ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এমন অনেক দাম্পত্য জীবনের অবসান দেখা যায় যাদের কেবল নিঃসন্তান হওয়ার কারণে বিচ্ছেদ ঘটছে। অনেক নারী আবার সন্তানের আশায় করছে শিরক। মাজারে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সন্তান লাভের মানত করতে। আবার অনেক নারী এমনও বিশ্বাস স্থাপন করে—যাদের বহু বছর ধরে গর্ভধারণ হচ্ছিল না অবশেষে মহান রবের অনুগ্রহে যখন সন্তান লাভ করে, তখন তারা মনে করে মাজারে মানত করার দরুন এটা সম্ভব হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা স্পষ্ট কুফরি। জগতে এমনিতেই কিছু থেকে কিছু হয় না। যা কিছু হয় মহান রবের পক্ষ থেকেই হয়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

> আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান

> করেন। অথবা তাদের পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।[১]

যেভাবে তিনি মানুষের মাঝে যে ক্রিয়াকর্ম ও নৈতিক গুণের ইচ্ছা করেন তা সৃষ্টি করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান করে দিতে পারেন। একইভাবে কোনো ব্যক্তি থেকে সর্বপ্রকার কল্যাণ ও উপকারিতার আশা শেষ হয়ে যাওয়া, এটাও তাঁরই কুদরতের কারিশমা।

বিখ্যাত তাফসিরকারক বাগাভি রাহি. বলেন, লুত আ. এর কেবল মেয়ে ছিল। কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। পক্ষান্তরে, ইবরাহিম আ. এর শুধু পুত্র সন্তান ছিল। তার সন্তানাদির মধ্যে কোনো মেয়ে ছিল না। আর নবিজির সন্তানসন্ততিদের মধ্যে ছেলেও ছিল এবং মেয়েও ছিল। যদিও খাতামুন আম্বিয়া হওয়ার সুবাদে তাঁর কোনো পুত্রসন্তান দীর্ঘজীবন লাভ করেনি। কারণ, সম্ভাবনা ছিল, কোনো পুত্র সন্তানের উপস্থিতিতে নবিজির ওফাতের পর লোকেরা তাকে নবির স্থলাভিষিক্ত করে ফেলবে। আল্লাহর নবিদের মধ্যে ইয়াহইয়া ও ঈসা আ. নিঃসন্তান ছিলেন।[২]

---

[১] সূরা আশ-শুরা, আয়াত, ৪৯-৫০

[২] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

দুধ পানের মেয়াদ

জননীদের উচিত আপন সন্তানদেরকে পূর্ণ দুবছর দুধ পান করানো। যদিও তাদের স্বামীরা তাদেরকে তালাক দিয়ে থাকে। এ সময়সীমা তার জন্য, যে শিশুসন্তানের দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। যে মা শিশুসন্তানের দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায় না, তার জন্য দুবছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দুধ ছাড়ানোর এখতিয়ার আছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুবছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ, পিতার ওপর হলো সে সমস্ত নারীর খোরপোশের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। কাউকে তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি চাপের সম্মুখীন করা হয় না। মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। ওয়ারিশদের ওপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতামাতা ইচ্ছা

> করে, তাহলে দুবছরের ভেতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, এতে তাদের কোনো পাপ নেই। আর যদি তোমরা কোনো ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোনো পাপ নেই। আল্লাহকে ভয় করো; জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ খুব ভালো করেই দেখেন।[১]

পিতার ওপর যার জন্য মূলত এ সন্তান জন্মদান করা হয়েছে, দুধ দানকারী জননীদের ভরণপোষণ বিধিমতো ওয়াজিব। কারণ, বংশগত বিচারে সন্তান পিতার দিকেই সম্বন্ধিত হয়। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো বিধান পালনের নির্দেশ দেওয়া হয় না। তাই মাকে সন্তানের কারণে কষ্টদান ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। তেমনি পিতাকেও সন্তানের কারণে কোনো কষ্ট দেওয়া হবে না। মায়ের উচিত নয়, তালাক হয়ে যাওয়ার পর সন্তানকে দুধ পান করাতে সে অনীহা প্রকাশ করবে। কিংবা স্বামীর কাছে বিধি-বহির্ভূভাবে বেশি ভরণপোষণ ও পারিশ্রমিক দাবি করবে। অথবা সন্তানের দেখাশোনা ও যত্নে ত্রুটি ও অবহেলা করবে। তেমনি পিতারও উচিত নয়, জেদবশত মায়ের পরিবর্তে ধাত্রী দিয়ে সন্তানকে দুধ পান করাবে আর তাকে পারিশ্রমিক দিবে, অথচ মাকে দুধ পানের পারিশ্রমিক দিবে না কিংবা মায়ের পারিশ্রমিক কমিয়ে দিবে।

মোটকথা, দুধ পানের ব্যয় পিতার দায়িত্বে। যদি পিতা জীবিত না থাকে তাহলে অনুরূপ ব্যয় ওয়ারিশের যিম্মায়। এখানে ওয়ারিশের ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা রাহি. এর মতে, ওয়ারিশ হলো ‹জি-রেহেম মাহরাম›। কারণ, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. এর কিরাতে وعلى الوارث ذى الرَّحْمِ المحْرَمِ مثْلُ ذلك আছে। আর এক কিরাত অন্য কেরাতের ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ওয়ারিশ দ্বারা শিশুর এমন 'জি-রেহেম মাহরাম' (আত্মীয়); শিশু মারা গেলে যে বা যারা তার মীরাস (পরিত্যক্ত ধনসম্পত্তি) পাবে। যে যতটুকু মীরাস পাবে, দুধ পানের ব্যয় তার ওপর সেই অনুপাতে বর্তাবে। যেমন, যদি 'জি-রেহেম মাহরাম' দুভাই অথবা দুবোন থাকে, তাহলে উভয় থেকে ভরণপোষণ ও পারিশ্রমিকের অর্থ অর্ধেক করে নেওয়া হবে। আর যদি এক ভাই ও এক বোন থাকে তাহলে

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত, ২৩৩

ভাই থেকে নেওয়া হবে দুই তৃতীয়াংশ, আর বোন থেকে নেওয়া হবে এক তৃতীয়াংশ। অবশ্য এটা তখন হবে যদি শিশুসন্তানের নিজের সম্পদ না থাকে। কিন্তু যদি শিশুর নিজের সম্পদ থাকে, তাহলে খরচের পুরো অর্থ তার সম্পদ থেকেই দেওয়া হবে।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ি রাহি. বলেন, ওয়ারিশ দ্বারা স্বয়ং সেই শিশুই উদ্দেশ্য, যে নিজ পিতার পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিশ। সুতরাং, তাকে দুধ পান করানোর পারিশ্রমিক তার সম্পদ থেকেই নেওয়া হবে। যদি তার কোনো সম্পদ না থাকে তবে সকল ব্যয়ভার মায়ের ওপর বর্তাবে। সন্তানের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য পিতামাতা ছাড়া অন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

যদি পিতামাতা পারস্পরিক সম্পত্তি ও পরামর্শক্রমে দুবছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দুধ ছাড়াতে চায় তবে তাদের এ জন্য কোনো গুনাহ নেই। যদি তোমরা কোনো প্রয়োজনে কিংবা মঙ্গল চিন্তায় এই ইচ্ছা করো, আপন সন্তানকে মায়ের পরিবর্তে কোনো ধাত্রীর দুধ পান করাবে, তবে এতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু শর্ত হলো, তোমরা বিধিমতো যা কিছু দেওয়া ধার্য করেছো তা অর্পণ করবে। অর্থাৎ, দুধ দানকারী ধাত্রীর হক পুরো প্রদান করবে, তাতে কোনোরূপ কাটছাঁট করবে না। কারো হক কম দেওয়া কিংবা মেরে দেওয়া খুবই অন্যায় কাজ। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে মায়েদের ও দুগ্ধ দানকারী ধাত্রীদের যে বিধান দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধাচরণ না হয়। সবসময় মনে রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাজ দেখেন। তালাক প্রদানের পর মাকে দিয়ে দুধ পান করানোতে কিংবা মায়ের বর্তমানে কোনো ধাত্রী দিয়ে দুধ পান করানোতে, তোমাদের কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই তো! কেউ দেখুক বা না দেখুক, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরের ভাবনা এবং মনের পরিবর্তনকেও দেখেন।

তালাকের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে এক ধরনের শত্রুতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যখন কোলে শিশুসন্তান থাকা অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয় তখন পারস্পরিক মনোমালিন্য ঝগড়ায় রূপ নেয়। শিশুসন্তান লালনপালনে পুরুষ কঠিন পরিস্থিতির শিকার হয়। পুরুষ কখনো সন্তানকে মা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কোনো নারীকে দিয়ে দুধ পান করাতে চায়। সেক্ষেত্রে বেচারি মা সন্তানের বিয়োগ-ব্যথায় ছটফট করতে থাকে। বিপরীতে, দুধ পান করানোর মতো

কেউ নেই মনে করে অনেক সময় মা নিজ সন্তানকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করে। যেন পুরুষ বাধ্য হয়ে তাকেই খোশামোদ করে এবং সে যেই পারিশ্রমিক দাবি করে তাতেই সম্মত হয়। আল্লাহ তায়ালা এ সম্বন্ধে মীমাংসা দান করেছেন, মায়ের ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। কেউ কারো কোনোরূপ ক্ষতি করার ইচ্ছা করবে না এবং কেউ কারো হক নষ্ট করবে না।

স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত

'ইদ্দতে হায়াত' অর্থাৎ, তালাকের ইদ্দত এবং 'ইদ্দতে ওফাত' অর্থাৎ, মৃত্যুর ইদ্দতের পার্থক্য স্পষ্ট করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের জীবন পূর্ণ করে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায় এবং স্ত্রীদেরকে দুনিয়াতে রেখে যায়, স্ত্রীদের জন্য উচিত তারা চার মাস দশ দিন নিজেদেরকে বিবাহ থেকে বিরত রাখবে। যতদিন এ সময়সীমা অতিবাহিত না হয়, কারো সঙ্গে যেন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়। যখন তারা নিজেদের সময়সীমা (ইদ্দত) পূর্ণ করে, হে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশরা, তোমাদের এখন কোনো গুনাহ নেই সেই কাজে যা তারা নিজেদের জন্য বিধিমতো করে। (বিধিমতোর অর্থ হলো, প্রস্তাবিত বিবাহটি শরিয়তের আলোকে শুদ্ধ ও জায়েজ হতে হবে এবং হালাল হওয়ার যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে।) এখন তাদের জন্য সাজসজ্জা করার এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি আছে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে অবহিত। যদি কোনো বৈধ কাজের জন্য তোমরা তাদের তিরস্কার করো কিংবা তাদের কোনো বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করো, তবে আল্লাহ তায়ালা এজন্য তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে, তাদের স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায়। তারপর তারা যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নিবে,

> তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে তাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ তোমাদের কাজকারবার সম্পর্কে জানেন।[১]

উপরিউক্ত ইদ্দতকাল ঐ বিধবা নারীর জন্য, যে গর্ভবতী নয়। কারণ, গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

> গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।[২]

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত, ২৩৪
[২] সূরা তালাক, আয়াত, ৪

ইদ্দতকালে বিবাহবিধি

ইদ্দত পালনকালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং পরিষ্কার শব্দে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া তো জায়েজ নেই, কিন্তু বিবাহের ইশারা-ইঙ্গিত দেওয়া জায়েজ। কারণ, কেউ মারা যেতে না যেতেই তার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া মনুষ্যত্ব বিবর্জিত কাজ; যেন প্রস্তাবদাতা এ ব্যক্তির মৃত্যুর অপেক্ষাতেই ছিল। বিশেষ করে বিধবা যদি গুণসম্পন্ন ও রূপবতী হয় তখন প্রস্তাবদাতারা বেশি তাড়াহুড়ো করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সে নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দাও, কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখো, তবে তাতেও তোমাদের কোনো পাপ নেই; আল্লাহ জানেন, তোমরা অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য শরিয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোনো কথা সাব্যস্ত করে নিবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা করো না। একথা জেনে রেখো, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাকো।

। মনে রেখো, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।[১]

ইদ্দত পালনকালে বিবাহ সম্বন্ধে নারীর কথাবার্তা বলা অশোভনীয়। দেখে মনে হয় নারী অকৃতজ্ঞ; স্বামী মারা যেতে না যেতেই তার কথা ভুলে গেছে, আগের বিবাহের মর্যাদা ও সম্মানের কোনোরূপ তোয়াক্কা করছে না। এখনো যার ঘরে ইদ্দত পালন করছে, যার মীরাস বণ্টন করাচ্ছে, তার মৃত্যু হতে না হতেই আরেকজনের সাথে বিবাহের আলাপ শুরু করে দিয়েছে। যেন অকৃতজ্ঞ স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুর অপেক্ষাতেই ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন— ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়ার পর বিবাহ করায় যেমন গুনাহ নেই, তেমনিভাবে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যে, স্বামী-মৃত্যুর-ইদ্দত পালন কালে নারীদেরকে বিবাহ-প্রস্তাব বিষয়ে ইঙ্গিতে তোমরা কিছু বলো। উদাহরণ হিসেবে বললে, আমার একজন নেককার স্ত্রী প্রয়োজন, কিংবা বিবাহের চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরে গোপন রাখা, কোনোভাবে তা উল্লেখ না করা; স্পষ্টও নয়, ইঙ্গিতেও নয়। আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবে জানেন, তোমরা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর তাদের সাথে তা খোলাখুলি আলোচনা করবে। আলোচনা না করে যেহেতু তোমরা ধৈর্যধারণ করতে পারবে না, তাই তোমাদেরকে ইঙ্গিতে বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায়, ইদ্দত চলাকালে যদি ইশারা-ইঙ্গিতেও বিবাহের আলোচনা না হয় সেটাই উত্তম। এখানে অনুমতির মাঝেও যেন প্রচ্ছন্ন তিরস্কার রয়েছে।

কিন্তু তোমাদের উচিত, তোমরা অনুমতির সীমা অতিক্রম করবে না। অর্থাৎ, ইদ্দত চলাকালে একে-অন্যের কাছে গোপনে বিবাহের স্পষ্ট অঙ্গীকার করো না— ইদ্দতের পর অবশ্যই বিবাহ করব। হ্যাঁ, এটুকু বলো যা শরিয়তে আইনসিদ্ধ; অর্থাৎ, ইশারা-ইঙ্গিতে কিছু বলতে পারো, স্পষ্টভাবে কিছু বলার অনুমতি নেই। যে পর্যন্ত না ইদ্দত তার পূর্ণ সময়কালে পৌঁছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সংকল্পও করো না। অর্থাৎ, ইদ্দত শেষ হলে অবশ্যই বিবাহ করব, এ ধরনের দৃঢ় সংকল্প করাও নিষেধ। অনেক সময় দৃঢ় সংকল্প করার পর অনেকেই নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, ইদ্দত চলাকালেই বিবাহ করে বসে। তাই সবরকম

[১] সূরা বাকারা, আয়াত, ২৩৫

পথ বন্ধ করার উপায় হিসেবে সংকল্প করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বিশ্বাস রাখো—তোমাদের মনে ইদ্দত চলাকালে বিবাহ করার যে ঝোঁক সুপ্ত হয়েছে তা আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে থাকো। জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা এতটাই ক্ষমাপরায়ণ—কোনো আকর্ষণ ও আগ্রহের জন্য তিনি কাউকে পাকড়াও করেন না। বরং যে ব্যক্তি দৃঢ় সংকল্প করার পর আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি পরম সহনশীল—আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে পাকড়াও করতে তাড়াহুড়ো করেন না।

তালাকপ্রাপ্তা নারীদের মোহরানা

যেসব নারীদেরকে তালাক দেওয়া হয়, তাদের মোহরানার হুকুম চার প্রকার।

১. বিবাহের সময় মোহরানা ধার্য করা হয়েছিল ‹খালওয়াতে সহিহা'র পর অর্থাৎ বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে এমন নির্জন ঘরে স্ত্রীর দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া যেখানে সহবাসের শরিয়তসম্মত কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। যেমন, স্ত্রীর ঋতুকাল থাকে না, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বা কোনো একজন রামাদান মাসের ফরয রোযা রেখেছে এমন হয় না; তাদেরকে তালাক দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বামীকে ধার্যকৃত পূর্ণ মোহরানা প্রদান করতে হবে।

২. বিবাহের সময় মোহরানা ধার্য করা হয়েছিল কিন্তু খালওয়াতের পূর্বেই তাদেরকে তালাক দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বামীকে ধার্যকৃত মোহরানার অর্ধেক প্রদান করতে হবে।

৩. বিবাহের সময় কোনো মোহরানা ধার্য করা হয়নি, খালওয়াতও হয়নি, খালওয়াতের আগেই তালাক দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্তারা কোনো মোহরানা পাবে না। তবে তাদেরকে প্রথা মতো কিছু হাত খরচ ও পরিচ্ছদ দিতে হবে।

৪. বিবাহের সময় মোহরানা ধার্য করা হয়নি, তবে খালওয়াত বা সহবাসের পর তালাক দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে 'মাহরে মিছিল' অর্থাৎ, সেই পরিবার ও বংশের মেয়েদের যে মোহরানা চালু আছে সেই পরিমাণ মোহরানা প্রদান করতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোনো মোহরানা সাব্যস্ত করার আগেই যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোনো পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দিবে। আর (খরচ দিবে) সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের ওপর দায়িত্ব। আর যদি মোহরানা সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার আগে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (অর্থাৎ, স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা ভিন্ন কথা। তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা করো, তবে তা হবে পরহেজগারির কাছাকাছি। পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলে যেও না। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সেসবই খুব ভালো করে দেখেন।[১]

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তোমাদের কোনো পাপ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে এমন সময় তালাক দাও যে, এখনো তাদেরকে স্পর্শ করোনি, তাদের দেহে হাত লাগাওনি এবং তাদের জন্য বিবাহের সময় তোমরা কোনো মোহরানাও ধার্য করোনি। এ অবস্থায় যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দাও, তবে তোমাদের কোনো গুনাহও নেই এবং তোমাদের কাছে মোহরানার দাবিও নেই। অবশ্য তাদেরকে ছেড়ে চলে আসার সময় তাদের উপকারের ব্যবস্থা করবে; অর্থাৎ, পরিধেয় বস্ত্র এবং কিছু খরচপাতি দিও। বিত্তবানের ওপর তার মর্যাদা অনুসারে এবং বিত্তহীনের ওপর তার সামর্থ্য অনুসারে ওয়াজিব। তবে এ উপকারের ব্যবস্থা হৃষ্টচিত্তে ও

[১] সূরা বাকারা, আয়াত, ২৩৬-২৩৭

উত্তমরূপে হওয়া কাম্য, বিচারকের শক্তি প্রয়োগে যেন না হয়। আর এ উপকারের ব্যবস্থা করা সৎকর্মপরায়ণদের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহর ওপর যাদের দৃষ্টি থাকে তারা সৃষ্টিজীবের উপকার ও কল্যাণ সাধনে কুণ্ঠাবোধ করে না।

আর যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দাও, অথচ তোমরা তাদের জন্য মোহরানা ধার্য করেছো, সেক্ষেত্রে সেই মোহরানার অর্ধেক প্রদান করতে হবে যা তোমরা বিবাহের সময় ধার্য করেছিলে। আর বাকি অর্ধেক তোমাদের থেকে মাফ হয়ে যাবে। তবে দুক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। একটি হলো, স্ত্রীরা যদি নিজেদের হক (অর্ধেক মোহরানা) মাফ করে দেয় এবং স্বামী থেকে কিছু গ্রহণ না করে। কিংবা যে পুরুষের হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে সে নিজের হক মাফ করে দেয়, অর্থাৎ স্বামী অর্ধেক মোহরানা দেওয়ার পরিবর্তে পূর্ণ মোহরানা দিয়ে দেয়। যদি ইতোমধ্যেই পূর্ণ মোহরানা দিয়ে থাকে তাহলে অর্ধেক মোহরানা স্ত্রী থেকে যেন ফেরত না নেয়। তোমাদের স্ব স্ব হক মাফ করে দেওয়াই তাকওয়া ও পরহেজগারির অধিক নিকটতর। এটি বলা হয়েছে নারী ও পুরুষ উভয়ের উদ্দেশ্যেই—তোমরা পরস্পরে সদ্ব্যবহার ও মহানুভবতার কথা ভুলে যেয়ো না। প্রত্যেকের চেষ্টা এটাই থাকা উচিত, পরোপকার ও দয়া-অনুগ্রহ যেন আমার দ্বারাই হয়। অন্যের দয়ার দিকে তাকিয়ে থাকা সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব, উদারচিত্ত ও মহানুভবতার পরিপন্থি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তোমরা যা করো তার সম্যক দ্রষ্টা।

হায়েয অবস্থায় মিলনবিধি

ইহুদিদের রীতি ছিল তারা ঋতুস্রাব কালে স্ত্রীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকত। তাদের পাশেও রাখত না। এমনকি তাদের সঙ্গে পানাহার অব্দি করত না; তাদের আলাদা একটি ঘরে থাকতে দিত।

একসময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

> "সহবাস ছাড়া অন্য সব কিছুই জায়েজ।"

তখন ইহুদিরা বলল, 'আমাদের বিরুদ্ধাচরণই মুহাম্মাদের উদ্দেশ্য।'

অন্যদিকে, খ্রিষ্টানদের রীতি ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা ঋতুস্রাব কালে একত্রে শয়ন থেকে শুরু করে সবকিছু করত, এমনকি স্ত্রী সম্ভোগ থেকেও বিরত থাকত না। মদিনায় সব ধর্মের লোকদের বসতি ছিল। একসময় এ বিষয়ে সাহাবিদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা নবিজির কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন;

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

> আর আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দিন, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকো।

ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঘনিষ্ঠ হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন করো তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন। তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতেই হবে। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দিন।[১]

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, লোকেরা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে, ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীদের সঙ্গে আচরণ কী হবে? আপনি বলুন, ঋতুস্রাব অপবিত্র। তাই তোমরা এ অবস্থায় তাদের থেকে পৃথক থাকো, অর্থাৎ তাদের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়ো না। তবে এক সঙ্গে পানাহার ও ওঠাবসা করতে কোনো বাধা নেই। উদ্দেশ্য শুধু নাপাকি থেকে দূরে থাকা। যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীরা ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না, অর্থাৎ সহবাসে লিপ্ত হয়ো না। ‹সুতরাং ঋতু অবস্থায় স্ত্রীদের হতে পৃথক থাকো›, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'সহবাস করো না' এছাড়া অন্য সবকিছু বৈধ।[২] তারপর যখন স্ত্রীরা উত্তমরূপে পবিত্র হয়, নাপাকির কোনো সন্দেহই আর অবশিষ্ট থাকে না, তখন তাদের সঙ্গে সহবাস করতে কোনো আপত্তি নেই। তবে সেই স্থান দিয়ে যেখান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে সহবাস করার অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ, যোনিপথ দিয়ে, পায়ুপথে নয়।

যদি ভুলক্রমে ঋতুস্রাব কালে সহবাস করে ফেলো তবে তাওবা করে নাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পছন্দ করেন যারা গুনাহ করে ফেলার পর তাওবা করে নেয় এবং যারা সম্পূর্ণরূপে নাপাকি থেকে পবিত্র থাকে তাদেরকেও পছন্দ করেন। সম্পূর্ণরূপে নাপাকি থেকে পবিত্র থাকে; যেমন, ঋতুস্রাব কালে সহবাস থেকে বিরত থাকে এবং যে স্থান দিয়ে সহবাস করা নিষেধ সেখান দিয়ে

[১] সূরা বাকারা, আয়াত, ২২২-২২৩
[২] মুসলিম ১/২৪৬

সহবাস করে না। যোনিপথ দিয়ে সহবাস করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, কারণ তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রের পর্যায়ে। তাদের জরায়ুতে যে বীর্যপাত হয় তা বীজের পর্যায়ে এবং সন্তানরা ফসলের পর্যায়ে। তাই তোমাদের অনুমতি আছে নিজ শস্যক্ষেত্রে শুয়ে বা বসে যেভাবে এবং যেদিক থেকে ইচ্ছা আসতে পারো। তবে শর্ত হলো, শস্যক্ষেত্রের বাইরে যাবে না; শুধু ক্ষেত ও চাষাবাদ স্থলে আসার তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যে স্থান চাষাবাদযোগ্য নয় অর্থাৎ, পায়ুপথ দিয়ে সহবাসের তোমাদের কস্মিনকালেও অনুমতি নেই। পায়ুপথ দিয়ে সহবাস করা মূলত লুত সম্প্রদায়ের কর্ম; এজন্য তাদের ওপর আল্লাহর গযব নিপতিত হয়েছে। আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'যে ব্যক্তি স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করে সে অভিশপ্ত।'[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,

> ‹যে ব্যক্তি ঋতুস্রাব অবস্থায় সহবাস করে কিংবা পায়ুপথে সহবাস করে অথবা কোনো জ্যোতিষীর কাছে যায় এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদের প্রতি অবতীর্ণ বিধানাবলির সাথে কুফরি করল।›[২]

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ আল আনসাসি রা. নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, ‹আমার স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় তার সঙ্গে আমার কোনো কিছু বৈধ আছে কি?› নবিজি বললেন, 'কাপড়ের ওপরের সব কিছু বৈধ।›[৩]

তারা যখন পবিত্র হবে তখন তাদের সাথে সহবাস করতে কোনো সমস্যা নেই। যখন হায়েযের রক্ত আসা বন্ধ হবে এবং সময় অতিক্রান্ত হবে, এরপরও স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস হালাল হবে না যে পর্যন্ত না সে গোসল করবে। তবে হ্যাঁ, যদি তার কোনো ওজর থাকে এবং গোসলের পরিবর্তে যদি তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ হয় তাহলে তায়াম্মুম করার পর তার কাছে আসতে পারবে।[৪]

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস, ৯৭৩৩; আবু দাউদ, হাদিস, ২১৬২
[২] তিরমিজি, হাদিস, ১৩৫
[৩] আবু দাউদ, ১/১৪৫; ইবনে মাজাহ, ১/২১৩; তিরমিজি, ১/৪১৫
[৪] ইবনে কাসির

স্মরণ রেখো, তোমাদেরকে নিছক মজা নেওয়ার জন্য সহবাসের অনুমতি দেওয়া হয়নি, বরং উদ্দেশ্য—এ মজাকে আখিরাতের লাভের উপায় বানাবে এবং নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু চেষ্টা করবে। অর্থাৎ, সহবাসের সময় আল্লাহর নাম নিবে যাতে সন্তানরা শয়তানের আছর থেকে নিরাপদ থাকে; নেক সন্তানের নিয়ত করবে, যাতে আখিরাতের ফসল হয় এবং তোমাদের জন্য দুআ ও ইস্তেগফার করে, যেন কিয়ামতের দিন তোমাদের কাজে আসে। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে থাকো; অর্থাৎ, ঋতুকালে ও পায়ুপথে সহবাস করা থেকে বিরত থাকো। মনে রেখো—আল্লাহর সঙ্গে তোমাদের মিলিত হতে হবে, তাঁর সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে এবং সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। সেদিন বীজ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে, অসময়ে ও অস্থানে বীজ ব্যবহার করে নষ্ট করা হয়নি তো? মুমিনদেরকে সুসংবাদ শোনাও, যারা স্বীয় বীজ যথাসময়ে ও যথাস্থানে ব্যবহার করেছে তারা এর প্রতিদান আখিরাতে পাবে।[১]

[১] মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

গর্ভপাতের গর্বপাঠ!

শিশুদেরকে জীবন্ত পুতে ফেলা কিংবা হত্যা করা—মহাপাপ ও গুরুতর জুলুম। চার মাসের পর গর্ভপাত করাও এই জুলুমের শামিল। কেননা, চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং সে জীবিত মানুষ হিসেবে গণ্য হয়। তেমনি যে ব্যক্তি গর্ভবতী নারীর পেটে আঘাত করে, ফলে গর্ভপাত হয়ে যায়, উম্মতের ঐকমত্যে তার ওপর গুররা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ, একটি গোলাম বা তার মূল্য দিতে হবে। যদি জীবিত অবস্থায় গর্ভপাত হয়, এরপর মারা যায়, তবে বয়স্ক লোকের সমান রক্তপণ দিতে হবে। একান্ত অপারগতা না হলে চার মাসের আগেও গর্ভপাত করা হারাম। তবে প্রথমোক্ত হারামের চেয়ে কিছুটা কম। কারণ, এটা কোনো জীবিত মানুষের প্রকাশ্য হত্যা নয়।[১]

জাহেলি যুগের মানুষরা কন্যা সন্তানদেরকে অপছন্দ করত; তাদেরকে জীবন্ত কবর দিত। তবে বিচার দিবসে ঐ সমস্ত শিশু কন্যাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। এ ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَيِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ

> আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?[২]

আলি ইবনে আবু তালহা রাহি. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَيِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ এর অর্থ হচ্ছে ঐ শিশুকন্যা প্রশ্ন করবে।

[১] মাযহারি

[২] সূরা তাকভির, আয়াত, ৮-৯

ইমাম আহমাদ রাহি. আয়িশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, উকাশার ভগ্নী জুযামাহ্ বিনতে ওহাব রা. হতে বর্ণিত আছে; তিনি নবিজিকে বলতে শুনেছেন—আমি গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস হতে মানুষকে নিষেধ করার ইচ্ছে করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, রোমক ও পারসিকরা গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে থাকে এবং তাতে তাদের সন্তানদেরকে বুকের দুধ পান করালেও সন্তানদের কোনো ক্ষতি হয় না। তখন মানুষরা সহবাসের সময় বীর্য বাইরে ফেলে দেওয়া সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন, 'এটা গোপনীয়ভাবে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করারই নামান্তর। আর وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۞ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ এর মধ্যে এরই বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

আজকাল দুনিয়াতে জন্মনিয়ন্ত্রণের নামে এমন পন্থা অবলম্বন করা হয় যাতে গর্ভসঞ্চারই হয় না। এর শত শত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। নবিজি একেও গোপনে শিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এর বিপরীতে কিছু বর্ণনায়, 'আযল' তথা বীর্যস্খলন প্রত্যাহার পদ্ধতির কথা আছে। এতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যাতে বীর্য গর্ভাশয়ে না যায়। এ সম্পর্কে নবিজি থেকে নীরবতা ও নিষেধ না করা বর্ণিত আছে। এটা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমিত বৈধ। তাও এভাবে করতে হবে যাতে স্থায়ী বংশবিস্তার রোধের পদ্ধতি না হয়ে যায়। আজকাল জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে কিছু ওষুধ ও পদ্ধতির উপদেশ দেওয়া হয়, যা সন্তান জন্মদানকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়। শরিয়তে কোনোভাবেই এর অনুমতি নেই।

---

[১] মুসনাদে আহমাহ, ৬/৪৩৪; মুসলিম, ৪/১০৬৬-১০৬৭; ইবনে মাজাহ, ১/৬৮৪; তিরমিজি, ৬/২৪৯

বিশ্বাসীদের কষ্ট দেওয়ার পরিণতি

যে যুগে অপরাধীরা ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বে এবং ঈমানদারদেরকে কষ্ট দিবে হোক না তারা মক্কার কাফের সম্প্রদায়—সবাইকে নিজেদের পরিণতি নিয়ে ভাবতে হবে। প্রত্যেকের জানা উচিত, আল্লাহর আযাব-গযব থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ۝١٠

> নিশ্চয়ই যারা মুমিন পুরুষ-নারীদেরকে বিপদাপন্ন করেছে, কিন্তু এরপর তাওবা করেনি; এদের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি; আর রয়েছে দহন যন্ত্রণা।[১]

নিশ্চয়ই যে লোকেরা মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তারপর তাওবাও করেনি, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে দোযখের আযাব এবং দুনিয়াতেও তাদের জন্য রয়েছে লেলিহান আগুনের শাস্তি। যেমন, পরিখা খননকারী লোকদের ঘটনাপ্রবাহের ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায়, ঈমানদারদের মধ্যে অনেক পুরুষ এবং অনেক নারী ছিল, যাদেরকে পরিখার কিনারায় দাঁড় করিয়ে লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। জাগতিক জীবনে এসব শাস্তি এসেছিল বিপদাপদের আকৃতিতে। তারা যেমন ঈমানদারদেরকে আগুনে ফেলে কষ্ট দিয়েছিল, তেমন আগুনের শাস্তি তাদেরকেও দেওয়া হবে। কাজেই প্রাচীন ইতিহাসের এসব অপরাধীরা যখন আল্লাহর আযাব ও শাস্তি

[১] সূরা বুরুজ, আয়াত, ১০

থেকে বাঁচতে পারেনি, ঠিক একইভাবে মক্কার কাফের লোকদেরও বুঝে নেওয়া উচিত, মুসলমানদেরকে জুলুম-নিপীড়ন ও কষ্ট দেওয়ার পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে ভোগ করতে হবেই হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে, এ আয়াত তিলাওয়াত করে ইবনে আব্বাস রা. বলতে লাগলেন, সেই অপরাধীদেরকে এ আযাব দেওয়ার কারণ হলো, তারা যেমন অন্যায় অপরাধ করেছিল, অনুরূপ শাস্তি দেওয়াই যথার্থ। কারণ, আল্লাহর নিয়ম হলো— কর্মের বিনিময় কর্মের অনুরূপ হয়ে থাকে। হাসান বসরি রাহি. বলেন, ‹মহীয়ান আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত দেখো। যারা তাঁর প্রিয় বান্দাদের হত্যা করেছে, তাদেরকে তাওবার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে।›

এটিই প্রতিফলের নিয়ম। যেমন কর্ম, তেমন ফল। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿١١﴾

> নিশ্চয়ই যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার তলদেশে নদ-নদী প্রবাহিত। এটাই মহাসাফল্য।[১]

এটা হলো ভালো-মন্দের পরিণতি। কেউ আল্লাহর আযাবে আক্রান্ত, আর কেউ তাঁর নিয়ামত ও পুরস্কারে ধন্য। সুতরাং, প্রত্যেকের উচিত, নিজের আখের গোছানো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾

> নিঃসন্দেহে তোমার রবের পাকড়াও কঠিন।[২]

এ থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। তিনি সবকিছুকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন, নাস্তি থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেন এবং তিনিই তা আবার ফিরিয়ে নেন। সুতরাং, যে রব মানুষ ও বিশ্বজগৎকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন, সেই রবই রোজ কিয়ামতে মানবজাতিকে দ্বিতীয় বার ওঠাবেন। সেই পরওয়ারদিগার পরম করুণাময় ও সীমাহীন দয়ালু; তিনি তাঁর এ গুণে নিজ বান্দাদের প্রতি ক্ষমাশীল।

---

[১] সূরা বুরুজ, আয়াত, ১১
[২] সূরা বুরুজ, আয়াত, ১২

যখন কোনো বান্দা নিজের উদাসীনতা ও গাফিলতির কারণে কোনো ভুলত্রুটি বা গুনাহ করে ফেলে এবং যখনই নিজের গুনাহের জন্য তাওবা করে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রতি প্রেমময়।

নবিজির স্ত্রীদের শান

নবিজির স্ত্রীরা সাংসারিক টানাটানির মাঝেও তাঁর সঙ্গে ঘর-সংসার করতে রাজি হয়েছেন। ইহলৌকিক ভোগবিলাস ছেড়ে পারলৌকিক জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এতে আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমরা রাসুলের স্ত্রী, সাধারণ কোনো মানুষের স্ত্রী নও, তোমরা উম্মাহাতুল মুমিনিন। সুতরাং, আল্লাহর আনুগত্য, তাকওয়া, অনন্য চরিত্র এবং নেক আমলের ক্ষেত্রে সবার আগে তোমাদেরই থাকা উচিত।"

হে নবি-পত্নীগণ, তোমরা পুণ্যময় কাজে যেমন অগ্রসর থাকবে, গুনাহের কাজেও তেমনি যোজন যোজন দূরে থাকবে। ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগের প্রচলিত মন্দ ও নোংরা কাজ থেকে অনেক দূরে থাকা উচিত। তোমরা অতি সচ্চরিত্রা ও সতী-সাধ্বী নারী। তোমাদের ঘরে আল্লাহর ওহী নাযিল হয় এবং ফেরেশতারা আগমন করেন। তোমাদের গৃহকর্তা অতি পূত-পবিত্র ব্যক্তিত্ব। নারীজাতির মধ্যে তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বুযুর্গ কোনো নারী শ্রেণি নেই। কাজেই নিজেদের ঘর থেকে বাইরে পদক্ষেপ ফেলা তোমাদের উচিত নয়। শয়তান ও মানুষের কোনো কুদৃষ্টি যেন তোমাদর তাকওয়ার পোশাকে না পড়ে। ঘরের বাইরে গিয়ে কোনো জীবাণুর উপসর্গ নিজেদের জন্য বয়ে আনবে না। এ ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

۞ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَٰلِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে ।

> এবং নেক আমল করবে, আমি তাকে দুবার তার প্রতিদান দিব। তার জন্য প্রস্তুত রেখেছি সম্মানজনক রিযিক।[১]

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সুসংবাদ দিচ্ছেন—হে নবি-পত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, মনোযোগ দিয়ে সর্বদা তাতে লেগে থাকবে এবং পুণ্যময় কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখবে, তাকে আমি তার নেক কাজের প্রতিদান দুবার দিব। একটি হলো তোমাদের আনুগত্য ও নেক আমলের জন্য, অন্যটি হলো রাসুলের মনোরঞ্জনের জন্য। উম্মুল মুমিনিনরা দুনিয়ার মোকাবিলায় আখিরাতকে বরণ করে নিয়েছেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য আখিরাতে সম্মানজনক রিযিক দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। যেগুলো তাদের জন্য জান্নাতে সঞ্চিত ও সুরক্ষিত হয়ে থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ۝٣٢

> হে নবি-পত্নীরা, তোমরা অন্য কোনো নারীর মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তোমরা কোমল ভঙ্গিতে কথা বলো না। এতে যার অন্তরে রোগ আছে সে লালায়িত হবে। আর তোমরা সংগত কথা বলো।[২]

এ আয়াতে মহান রব বলেছেন—হে নবি-পত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। তোমাদের মান-মর্যাদা সকল নারীর চেয়ে ভিন্ন ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে 'সাইয়্যিদুল মুরসালিন' (প্রধান রাসুল) এর স্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা এই নবির স্ত্রী হিসেবে পরিচিত—ধন্য নারী। তোমাদেরকে 'উম্মাহাতুল মুমিমিন' এর খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। জগতের কোনো নারী এই মর্যাদায় তোমাদের অংশীদার নয় এবং সমকক্ষও নয়। তবে এই মর্যাদার জন্য একটি শর্ত রয়েছে, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।' আল্লাহর কাছে মর্যাদার ভিত্তি হলো–তাকওয়া।

[১] সূরা আহযাব, আয়াত, ৩১

[২] সূরা আহযাব, আয়াত, ৩২

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

> তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি।[১]

অর্থাৎ, পরহেজগারির গুণ হাসিল না করে স্রেফ নবির স্ত্রী হওয়া এবং নবির সাথে সম্পর্কিত হওয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কিছু নেই। এ আয়াতে আল্লাহ উম্মাহাতুল মুমিনিনদেরকে কিছু হিদায়াত ও শিষ্টাচারের কথা বলেছেন। যা তাদের তাকওয়ায় শক্তি জোগাবে এবং পরহেজগারির রক্ষাকবচও বটে।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন— হে নবি-পত্নীগণ, তোমরা যদি আল্লাহ প্রদত্ত তাকওয়া ও শুচিতা রক্ষা করতে চাও, তাহলে পরপুরুষের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলো না। আল্লাহ না করুক, যে ব্যক্তির মনো-প্রবৃত্তিগত কোনো রোগ থাকে, সে তোমাদের কোমল কণ্ঠের কথায় তোমাদের প্রতি লালায়িত হয়ে পড়বে। স্বভাবতই নারীর কণ্ঠে কোমলতা ও নাজুকতা বিদ্যমান। এজন্যই যদি কোনো নারী পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলে, সেটাকে ব্যভিচারের উপসর্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটা তাকওয়া এবং চরিত্রের জন্য ক্ষতিকর। যার মনে খাহেশ ও জৈবিক চাহিদাগত রোগ আছে, সে এমন কোমল ও লাস্যময়ী কথাবার্তায় নারীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়ে। এতে বড় ধরনের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই হে নবি পত্নীগণ, তোমরা তোমাদের সুউচ্চ মর্যাদার খাতিরে এ ব্যাপারে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করো। এমনভাবে কথা বলো না, যার কারণে কোনো লোভাতুর ব্যক্তির মাঝে লোভের উদ্রেক হয়। যদি কারো সাথে প্রয়োজনে কথাবার্তা বলতেই হয়, তখন সাদামাটা কথা বলো। কিছুটা কর্কশ ভঙ্গিতে কথা বলো। এতে শ্রোতার মনে কোনো ধরনের বাজে চিন্তা আসবে না। কর্কশ ও পুরুষীয় ভঙ্গির কথাবার্তা বাহ্যদৃষ্টিতে অভদ্র ও অমার্জিত হলেও এটাই নারীর সম্মান-সম্ভ্রমের রক্ষাকবচ। যে কারণে অন্যের মন ভাঙে এবং অন্যের ইজ্জত-আবরু নষ্ট হয়, সেটাই প্রকৃত অভদ্র কাজ। তবে নিজেদের সুরক্ষার জন্য সব থেকে নিরাপদ পন্থা হলো, নিজের ঘরে অবস্থান করো। বিনা প্রয়োজনে ঘর

[১] সূরা হুজুরাত, আয়াত, ১৩

থেকে বের হওয়া, তাও বেপর্দায়, শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষেধ। কোনো নারীর বেপর্দায় ঘর থেকে বের হওয়া মানেই কামাসক্ত লোকদের সুপ্ত লোভকে জাগ্রত করা। পূত-পবিত্র দৃষ্টি থেকে নারীদের মুখমণ্ডল হেফাজত করা। এজন্যই তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে না বের হয়। একই উদ্দেশ্যে অন্যান্য নারীদেরকেও অনুরূপ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়।[১]

এখানে নারীদেরকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, তারা বাইরে গেলে নানান ফিতনা-ফাসাদে আক্রান্ত হয়ে যাবে। বাইরের ব্যস্ততা ব্যভিচারের উপসর্গ। কাজেই এই ছিদ্রপথ বন্ধ করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥

> আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন পুরুষকে সাক্ষী আনো। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে ব্যভিচারিণীদেরকে ঘরবন্দি রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে; অথবা, আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করে দেন (ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঘরবন্দি রাখো)।[২]

বেপর্দা ব্যভিচারের উৎপত্তিস্থল। তাই ব্যভিচার বন্ধ করতে চাইলে আগে বেপর্দা বন্ধ করা জরুরি। বর্তমান আইনেও এই নিয়ম রয়েছে, যে বিষয় আইনগত নিষিদ্ধ এবং অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়—তার মাধ্যম, উপসর্গ, ভূমিকা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ও নিষিদ্ধ। এগুলোকেও অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। কারণ, অপরাধ সংঘটনে এগুলো সহায়ক ও অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা রাখে।

[১] সূরা তালাক, আয়াত, ১
[২] সূরা নিসা, আয়াত, ১৫

যেমন, কাউকে হুমকি দেওয়া, আতঙ্কিত করা, আটক করা, কোনো খুনিকে ধারালো কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করা ইত্যাদি। ঠিক একই নিয়ম ইসলামি শরিয়তেও প্রযোজ্য। এখানে ব্যভিচারও হারাম, তার মাধ্যম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ও হারাম। আনুষাঙ্গিক বিষয় বলতে বলা হচ্ছে—বেগানা নারীর সাথে সাক্ষাৎ করা, তার সাথে কথাবার্তা বলা, তার কোমল কণ্ঠস্বর শোনা ইত্যাদি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

> নিশ্চয়ই কান, চোখ, অন্তর—এগুলোর প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।[১]

নারীদর জন্য বাড়ির অন্দরমহলে অবস্থান করাই শ্রেয় ও নিরাপদ। যারা আকারে মানুষ কিন্তু প্রকারে শয়তান তাদের কুদৃষ্টি হতে নারীদের রক্ষা করতে এই মহৌষধ কাজে লাগাতে হবে। এটা তাদের জন্য প্রকৃতির অমোঘ ও অব্যর্থ দাওয়াই। ইসলামপূর্ব মূর্খতার যুগে নারীরা বেপর্দায় ঘুরে-বেড়াত। মহাপবিত্র ইসলাম এই অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার কাজকে সকল নারীর জন্য সাধারণভাবে এবং নবি-পত্নীদের জন্য বিশেষভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। কারণ, নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন নিশ্চিতভাবে কামাসক্ত ব্যক্তির মাঝে আসক্তি উদ্রেক করে। আর নবি-পত্নীদের জন্য এই সৌন্দর্য প্রদর্শন আরও জঘন্য; কেননা, এটা নবিজির মনঃকষ্টের কারণ।

বাড়ির অন্দরমহলে অবস্থান করা এবং জাহেলি যুগের মতন সৌন্দর্য প্রদর্শন না করার বিধান যদিও নবি-পত্নীগণকে সম্বোধন করে নাযিল হয়েছে; কিন্তু এসব বিধান কেবল তাদের জন্যই নির্ধারিত নয়। তারা তো পালন করবেনই; সাধারণ মুমিন নারীরাও এই বিধান পালন করবে। বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া, নিজের শোভা-সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য পরপুরুষকে দেখানো, খোলা মুখে বাইরে বের হওয়া, অন্যদের সাথে কথাবার্তা বলা— এগুলা যেকোনো মুসলমান রমণীর জন্য হারাম। এগুলোতে নবি-পত্নীদের কোনো বিশেষত্ব নেই।

নারীর নগ্নতা, মনোহারী অঙ্গভঙ্গি, রঙ্গরসিকতা অন্য পুরুষের মাঝে বিশেষ মুহূর্ত

[১] সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত, ৩৬

জাগিয়ে তোলে। এগুলোই ব্যভিচারের ভূমিকা। এই ফিতনার দ্বার বন্ধ করতে হলে নারীদের বাড়ির অন্দরমহলে অবস্থান ছাড়া গত্যন্তর নেই। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হবে না। প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময় আপাদমস্তক ঢেকে নিবে এবং তুলনামূলক ময়লা ও অসুন্দর কাপড় পরিধান করবে। রাস্তার এক পাশ দিয়ে হাঁটবে। পুরুষদের থেকে দূরে থাকবে। নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার এসব নিয়ম ও শিষ্টাচার হাদিস দ্বারা বর্ণিত।

স্বামী-স্ত্রীর আচারকথন

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম সম্পর্ক। স্বামী-স্ত্রী একে-অপরের পরিচ্ছদ। দুজনের মধ্যকার ভালোবাসা আল্লাহ তায়ালারই দান। কুরআনে কারীমে আছে—আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাঝে প্রীতি ও করুণা সৃষ্টি করেছেন। বিবাহের পর একে-অপরের প্রতি গভীর ভালোবাসা, মায়া-মমতা, প্রীতি ও করুণা মহান রবেরই দান। স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে ভালোবাসা ইবাদতের অংশবিশেষ। স্বামীকে তার স্ত্রী ভালোবাসার ব্যাপারে হাদিসে আছে, "তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তার স্ত্রীদের কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।"

একইভাবে স্ত্রীকেও স্বামীর আনুগত্য করতে হবে। স্বামী অসন্তুষ্ট হবে এমন সব গর্হিত কাজ থেকে সদাসর্বদা নিজেকে দূরে রাখবে। স্বামীকে এমনভাবে ভালোবাসবে যেন সেই ভালোবাসা স্বামীকে তার ইবাদত থেকে বঞ্চিত না করে। একে-অপরের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের একটি হলো— সুন্দর ও মার্জিত আচার-আচরণ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তাহলে তারা দুজন মিলে কোনো মীমাংসা করে নিলে পাপ নেই। আর আপস-মীমাংসাই শ্রেয়। মানুষের মনে লোভজনিত কৃপণতা

বিদ্যমান। যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ এবং মুত্তাকি হও, তবে তোমরা যা করো আল্লাহ তো তার খবর রাখেন।[১]

এখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষা ও অগ্রাহ্যের আশঙ্কা করে; যেমন, স্ত্রী কুৎসিত কিংবা বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছে, কিংবা বিভিন্ন আলামত দ্বারা বুঝতে পারে, স্বামী তাকে তালাক দিতে চায় এবং তার জায়গায় অন্য কাউকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চায়। এমন অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর গুনাহ নেই আপস-মীমাংসা করে নিলে। যেমন, স্ত্রী খোরপোশ প্রদান ও রাত যাপনের বাধ্যবাধকতা থেকে স্বামীকে মুক্ত করে কিংবা পরিমাণ হ্রাস করে দিল আর স্বামী তাকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দিল। তালাক, বিচ্ছেদ এবং পারস্পরিক কলহ অপেক্ষা আপস-মীমাংসাই শ্রেয়। সেজন্য যদি উভয়ের নিজ নিজ অধিকারে কিছুটা ছাড় দিতে হয় তাও ভালো। কাজেই নিজ অধিকার পুরোপুরি উসুল করবে, স্ত্রীও এমন জেদ ধরবে না এবং স্বামীও এই পণ করবে না, সে স্ত্রীকে যে কোনো মূল্যে ত্যাগ করেই ছাড়বে। মানুষের স্বভাব প্রকৃতিতে লোভ ও কৃপণতা রাখা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই স্বামী ও স্ত্রীর কেউ নিজ প্রাপ্য ও পাওনা হ্রাস করতে চায় না। প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারে লোভী ও কৃপণ। কিন্তু মানুষের উচিত নিজ লোভ ও কৃপণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অন্যদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।

হে পুরুষরা, যদি তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো এবং তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা থেকে বিরত থাকো, তবে নিঃসন্দেহে যা কিছু তোমরা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিদান দিবেন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

তোমরা যতই আশা করো না কেন স্ত্রীদের মাঝে কখনোই সমতা রক্ষা করতে পারবে না। তাই তোমরা (একজনের প্রতি) সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে তোমরা অপরকে ঝুলন্তের মতো করে রাখবে।

[১] সূরা নিসা, আয়াত, ১২৮

আর যদি তোমরা মীমাংসা করে নাও এবং আল্লাহকে ভয় করো তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

অর্থাৎ, যখন একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তখন এমন করো না—সম্পূর্ণভাবে একজনের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং অপরজনকে ঝুলন্ত রেখে দিবে। যেন সে বিধবাও নয়, সধবাও নয়। সে কাউকে বিবাহও করতে পারে না, আবার স্বামী দ্বারাও উপকৃত হতে পারে না। যদি ভালোবাসা ও হৃদয়ের টানে সমতা রক্ষা করতে না পারো, তবে এটাও করো না—পালা করে রাতযাপনে ও খোরপোশ প্রদানে একজনের দিকেই সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়বে। এটা তো তোমাদের আয়ত্বাধীন; পালা বণ্টন, খোরপোশ প্রদান ইত্যাদিতে সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করবে। আয়িশা রা. এর প্রতি অধিক ভালোবাসা সত্ত্বেও নবিজি সকল স্ত্রীর হক সমানভাবে আদায় করতেন। বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমি ইচ্ছাধীন বিষয়ে প্রত্যেকের হক সাধ্যানুযায়ী সমানভাবে আদায় করি। কিন্তু যে বিষয় আমার ইচ্ছাধীন নয় অর্থাৎ হৃদয়ের ভালোবাসা, এ বিষয়ে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' আয়িশা রা. এর প্রতি নবিজির অধিক ভালোবাসার কারণ ছিল, তিনি অভ্যন্তরীণ গুণ-গরিমা ও সদ গুণে মারইয়াম আ. এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন এবং সিদ্দিকের কন্যা সিদ্দিকা ছিলেন।

যদি তোমরা সংশোধন করে নাও অর্থাৎ, অতীতে যে অবিচার করেছো, যদি তার প্রতিকার করো এবং ভবিষ্যতে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করা থেকে বিরত থাকো, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তিনি তোমাদের বিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধ ক্ষমা করবেন।

আর যদি আপস-মীমাংসা ও সমঝোতার কোনো উপায় বের না হয় এবং স্বামী-স্ত্রী তালাক কিংবা খুলআ তালাকের মাধ্যমে পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ প্রত্যেককে অভাব মুক্ত করে দিবেন আপন প্রাচুর্য দ্বারা। আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মবিধানকারী; তাঁর ইচ্ছায় স্বামী অন্য স্ত্রী পেয়ে যাবে এবং স্ত্রী অন্য স্বামী পেয়ে যাবে। জীবিকার ক্ষেত্রে এক-অন্যের মুখাপেক্ষী থাকবে না। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর ঐশ্বর্য ও রহমত ব্যাপক ও বিস্তৃত; তাঁর সকল বিধান অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়।

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত, ১২৯

আল্লাহর যা কিছু আছে আসমানে ও জমিনে সবই তাঁর মালিকানাধীন। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা দেন। এটা তাঁর প্রাচুর্যময় হওয়ার দলিল। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক। এর চেয়ে অধিক প্রাচুর্য আর কী হতে পারে?

গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের সময়সীমা

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

> তাকে গর্ভধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস।[১]

ইবনে কাসির রাহি. বলেন, আয়াতের মর্ম হলো, তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে।[২] আবার অন্যান্য তাফসিরবিদ মনে করেন, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময় ছয় মাস আর স্তন্যদানের সময় দুই বছর।

একবার উসমান রা. এর শাসনামলে এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। জনৈক বিবাহিত লোকের বিবাহের ছয় মাসের মাথায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। লোকটি উসমান রা. এর কাছে এসে কাহিনি খুলে বলল। শুরুতে উসমান রা. দ্বিধান্বিত ছিলেন। তখন আলি রা. বললেন, দ্বিধান্বিত হওয়ার কিছুই নেই। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতগুলো দেখুন;

> তাকে গর্ভধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস।[৩]

অন্য আয়াতে রয়েছে,

> মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।[৪]

আরো একটি আয়াতে আছে,

---

[১] সূরা আহকাফ, আয়াত, ১৫
[২] সূরা লুকমান, আয়াত, ১৪
[৩] সূরা আহকাফ, আয়াত, ১৫
[৪] সূরা বাকারা, আয়াত, ২৩৩

| তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে।[১]

এসব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, দুধ পান করানোর সময় দুই বছর। আর আমরা জানি, গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের সময় ত্রিশ মাস থেকে দুই বছর বা চব্বিশ মাস বাদ দিলে থাকে ছয় মাস। এই ছয় মাসই হলো গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়। আলি রা. এর ব্যাখ্যা উসমান রা. মেনে নিলেন। তাহলে বোঝা গেল, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময় ছয় মাসও হতে পারে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, গর্ভধারণে যদি নয় মাস লাগে, দুধ পান করানোর জন্য সময় থাকে একুশ মাস। আর গর্ভধারণে যদি সাত মাস লাগে, তখন দুধ পান করানোর জন্য থাকে তেইশ মাস। এভাবে ত্রিশ মাস পূর্ণ হয়, যার বিবরণ এ আয়াতে রয়েছে,

| তাকে গর্ভধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস।[২]

হানাফি ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহি. থেকে স্তন্যদানের সময় আড়াই বছরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাফসিরে মাদ্রারিতে ইমাম আবু হানিফা রাহি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, শিশুকে বাহুতে ও কোলে নেওয়া। আমরা জানি, শিশুকে তার দুগ্ধকালে কোলে নেওয়া হয়। এতে শিশুর শৈশবকালকে বোঝায়, যা আড়াই বছরের দিকে ইঙ্গিত করে। পক্ষান্তরে, সূরা বাকারার এই আয়াত, ‹মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।›[৩] এখানে বিনিময়ে দুগ্ধপান করানোর কথা বর্ণিত হয়েছে। দুই বছরের চেয়ে বেশি সময় দুগ্ধপান করানোর খরচ জোগানো পিতার কর্তব্যে পড়ে না। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিকাহবিদদের মতে দুই বছর অনুযায়ী স্তন্যদানের ফতোয়া দেওয়া হয়; কিন্তু স্তন্যদানের বিধানের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ইমাম আবু হানিফা রাহি. এর মত আমল করাই শ্রেয়।

---

[১] সূরা লুকমান, আয়াত, ১৪
[২] সূরা আহকাফ, আয়াত, ১৫
[৩] সূরা বাকারা, আয়াত, ২৩৩

স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাপন

পুরুষরা কেন দ্বিগুণ মীরাস পাবে—নারীদের এ প্রশ্ন দূর করার জন্য বলা হয়েছে, তাদের ওপর পুরুষের সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পুরুষদেরকে সৃষ্টিগত ও অর্জিত উভয় প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষদেরকে নারীদের ওপর কর্তৃত্ববান বানিয়েছেন; সংশোধনের উদ্দেশ্যে নারীদেবকে শাসন করার অনুমতি দিয়েছেন। প্রয়োজনে মৃদু প্রহারেরও অনুমতি আছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

> ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ۝٣٤

> পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক এজন্য যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে (তাদের জন্য) ব্যয় করে। সুতরাং, পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হেফাজতকারিণী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হেফাজত করেছেন। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদেরকে বোঝাও; বিছানা আলাদা করে দাও; (মৃদু) প্রহার করো তাদেরকে। তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বমহান,

| শ্রেষ্ঠ।[১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন—পুরুষ দুই কারণে নারীর কর্তা। একটি কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের একে-অপরের ওপর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন অর্থাৎ, সৃষ্টিগতভাবেই তিনি পুরুষদেরকে নারীদের ওপর বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ নারীর কর্তা হবে এবং নারী তার অধীন ও আজ্ঞাবহ হবে। এটা এ শ্রেষ্ঠত্বেরই দাবি। আল্লাহ তায়ালা নারীদের তুলনায় পুরুষদেরকে বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, সহনশীলতা, সুচিন্তা, কর্মশক্তি, চিন্তাশক্তি, দৈহিক শক্তি ইত্যাদি বহুগুণ বেশি দান করেছেন। নবুওয়াত, ইমামাত, খিলাফত, রাজকর্তৃত্ব, বিচারিক ক্ষমতা, সাক্ষ্যদান, জিহাদ, জুমআ, দুই ঈদের নামাজ, আযান, খুতবা, জামাতে নামাজ, দ্বিগুণ মীরাস, বিবাহের মালিকানা, একাধিক বিবাহ, তালাকের অধিকার, পুরো মাস নামাজ আদায়, পূর্ণ ত্রিশদিন রামাদানের রোযা রাখা, ঋতুস্রাব, নিফাস ও গর্ভধারণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ইত্যাদি শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তায়ালা পুরুষদেরকেই দান করেছেন। এসব শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই নবিজি বলেছেন,

> 'যদি আমি কোনো ব্যক্তিকে অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীদেরকে নিজ স্বামীদেরকে সিজদা করার আদেশ দিতাম।'

দৈহিক শক্তিতে নারীরা পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। এটা স্পষ্ট, শক্তিমান ও সক্ষম ব্যক্তির ওপর দুর্বল ও শক্তিহীন ব্যক্তির কর্তৃত্ব করার অধিকার নেই এবং তা সে করতেও পারে না। সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তায়ালা নারীদের স্বভাবে রেখেছেন আর্দ্রতা ও নাজুকতা। আর পুরুষদের প্রকৃতিতে রেখেছেন উষ্ণতা ও শক্তিমত্তা। এ কারণেই সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, লড়াই-সংগ্রাম, বীরত্ব ও বাহাদুরি, সরকার ও রাষ্ট্রের জন্য জীবন বাজি, সীমান্ত রক্ষা এবং সরকার রক্ষায় যে কোনো কঠিন ও কষ্টকর কাজের প্রয়োজন পড়ে, তা সব আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব পুরুষদের কাঁধেই চাপে। পুরুষদের গঠন ও দৈহিক আকৃতিই তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের প্রমাণ বহন করে। আর নারীর স্বভাবগত নাজুকতা, গর্ভধারণ এবং প্রসব তার দুর্বলতা ও অক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে নারীর ওপর দুধরনের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত, ৩৪

একটি সৃষ্টিগত, যার কথা একটু আগেই বলা হলো। অপরটি চেষ্টালব্ধ বা অর্জিত। শ্রেষ্ঠত্বের এ দ্বিতীয় কারণটি হলো, পুরুষরা নারীদের জন্য নিজ সম্পদ হতে দেদারছে ব্যয় করেছে। পুরুষদের নারীদের ওপর কর্তৃত্ববান হওয়ার এটি দ্বিতীয় কারণ। এ বিষয়টি অর্জিত ও উপার্জিত। অর্থাৎ, পুরুষরা নারীদের ওপর এজন্য কর্তৃত্ববান—তারা নিজেদের অর্থ ব্যয় করে নারীদেরকে মোহরানা প্রদান করেছে। তাদের ভরণপোষণ ও খোরপোশ নিজ দায়িত্বে নিয়েছে। তাই নারীদের প্রতি পুরুষদের অনুগ্রহ রয়েছে। আর অনুগ্রহকারীরই রয়েছে কর্তৃত্ব করার অধিকার। কারণ তারা নারীদের রক্ষাণাবেক্ষণকারী এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের জোগানদাতা। নিজেদের অপেক্ষা তাদের আরাম ও শান্তির দিকে অধিক খেয়াল রাখে।

এ সৃষ্টিগত ও অর্জিত শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণাবলির কারণেই তাকদিরের অধিপতি মহাপ্রভু পুরুষকে নারীর কর্তা বানিয়েছেন; পুরুষকে নেতৃত্ব দান করেছেন। এটা স্পষ্ট, দাতার হাত ওপরে থাকে এবং গ্রহীতার হাত নিচে থাকে। এসব কারণেই নারীদেরকে পুরুষদের অধীন ও আজ্ঞাবহ বানিয়েছেন।

যুক্তির বিচারে এক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১। পুরুষ কর্তা, নারী আজ্ঞাবহ,

২। নারী কর্তা, পুরুষ আজ্ঞাবহ এবং

৩। পুরুষ ও নারী উভয়ে সমান; কেউ কারো কর্তা নয়, কেউ কারো আজ্ঞাবহ নয়। এছাড়া আর কোনো সম্ভাবনা যুক্তিতে আসে না।

শরিয়ত প্রথম সম্ভাবনাকেই গ্রহণ করেছে অর্থাৎ, পুরুষকে কর্তা এবং নারীকে তার আজ্ঞাবহ সাব্যস্ত করেছে। আর এ আদেশ দিয়েছে—পুরুষ যেহেতু কর্তা ও অভিভাবক তাই নারীর সকল ব্যয়ভার পুরুষের দায়িত্বে এবং পুরুষের ওপরই মোহরানা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা অনুসারে নারীরা যদি চায় আমরাই কর্তা হব, পুরুষরা আমাদের আজ্ঞাবহ হবে, তবে পুরুষদের সকল ব্যয়ভার নারীরা বহন করবে। আর নারীদের ওপর পুরুষদের মোহরানা ওয়াজিব হবে এবং বিবাহের পর যে সন্তানসন্ততি হবে তাদের ভরণপোষণ এবং শিক্ষার ব্যয়ভার নারীরাই বহন করবে। এমনকি ঘর

ভাড়ার দায়িত্বও নারীদের হবে। পুরুষ কর্তা হওয়ার অবস্থায় এসব ব্যয়ভার যেরূপ পুরুষের দায়িত্বে ছিল, তদ্রূপ নারীরা যখন পুরুষদের কর্তা হবে তখন পুরুষদের পরিবর্তে নারীরা এসব খরচের দায়িত্ব বহন করবে।

যদি নারীরা তৃতীয় সম্ভাবনা গ্রহণ করে, পুরুষ ও নারী উভয়ে সমান; কেউ কারো কর্তা নয়, কেউ কারো আজ্ঞাবহ নয়, তবে তখন মোহরানার কোনো ব্যাপার থাকবে না। কারো ভরণপোষণের দায়িত্বও অন্য কারো ওপর থাকবে না। কারণ সমতার দাবি হলো যার যার দায়িত্ব তার নিজের। পারিবারিক ব্যয় ও ঘরভাড়া অর্ধেক পুরুষের ওপর ওয়াজিব হবে এবং অর্ধেক নারীর ওপর। সন্তানদের ভরণপোষণ ও তাদের শিক্ষার ব্যয়ভার অর্ধেক বাবার দায়িত্বে থাকবে আর অর্ধেক থাকবে মায়ের দায়িত্বে। পুরুষ ও নারীর প্রত্যেকে তার ব্যক্তিগত ব্যয় নিজেই বহন করবে। যদি নারী অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষের সমতা দাবি করে দায়িত্ব ও আর্থিক যিম্মাদারিও সমানভাবে গ্রহণ করবে। সমান অংশীদার ব্যক্তিরা প্রত্যেকে নিজেই নিজের দায়িত্বশীল ও যিম্মাদার হয়, অপর অংশীদারের দায়িত্ব ও যিম্মা গ্রহণ করে না।

শরিয়ত পুরুষকে কর্তা মনোনীত করেছে, যা অত্যন্ত ইনসাফপূর্ণ ও বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্ত। নারীদের জন্য এর চেয়ে বেশি উপকারী ও উপযোগী কোনো সিদ্ধান্তই হতেই পারে না। এজন্য নারীদের ওপর শোকর আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা তাদের দুর্বলতা, শক্তিহীনতা এবং আয় উপার্জনের অক্ষমতার কারণে তাদেরকে স্বামীদের আজ্ঞাবহ বানিয়ে প্রেম ও ভালোবাসার প্রতি মূর্তপ্রতীক বানিয়েছেন। বিপরীতে সকল ব্যয়ভার ও দায়িত্ব থেকে তাদেরকে মুক্ত রেখেছেন।

সুতরাং, সেই নারীরাই পুণ্যবতী যারা আপন স্বামীদের অনুগত। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করে আনুগত্য করে যায় এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তাদের অর্থসম্পদ ও পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে। আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন— স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তাদের সম্পদ ও পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করো। রবের তাওফিকে উত্তম স্ত্রীরা স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের আবরু ও স্বামীর সহায়সম্পদের কোনো ধরনের খেয়ানত করে না। নবিজি বলেন,

> উত্তম স্ত্রী সেই, যখন তুমি তাকে দেখো, তুমি আনন্দিত হও; যখন তুমি তাকে আদেশ করো, সে তোমার আদেশ মান্য করে; যখন তুমি অনুপস্থিত থাকো, সে নিজেকে ও (তোমার) অর্থসম্পদকে হেফাজত

> করে। এ কথাগুলো বলার পর নবিজি ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ আয়াতটি পাঠ করেন।[১]

এই আলোচনা ছিল পুণ্যবতী নারীদের অবস্থা নিয়ে। এরপর যে নারীরা পুণ্যবতী নয় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

> যদি তোমরা আশঙ্কা করো তাদের মধ্যে বিরোধের, তবে নিযুক্ত করো একজন সালিশ পুরুষের পরিবার হতে এবং একজন সালিশ নারীর পরিবার হতে। যদি এ দুজন মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ মিলমিশ দান করবেন তাদের মধ্যে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব জানেন।[২]

আল্লাহ তায়ালা বলেন—তোমরা যে নারীদের অবাধ্যতা ও দুর্ব্যবহারের আশঙ্কা করো, যার আলামত হলো, নারী কর্কশ ভাষায় স্বামীর কথার উত্তর দেয়, যখন স্বামী তাকে কাছে ডাকে, অথচ তার ডাকের কোনো পরোয়া করে না। আর এটা স্বামীর মাথায় চড়ে বসার লক্ষণ।

যে স্ত্রীদের সম্পর্কে মনে হবে, তারা মাথায় উঠেছে, তাদেরকে সতর্ক ও সংশোধন করার প্রথম ধাপ হলো—তাদেরকে বোঝাও, সদুপদেশ দাও; স্বামীর অবাধ্যতার মন্দ দিকগুলো তাদের সামনে তুলে ধরো। তাদেরকে বলো, তোমার ওপর আমার হক আছে এবং আমার আনুগত্য তোমার ওপর ফরয। তাই অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসো।

যদি তোমাদের বোঝানো ও সদুপদেশ দানের পরও তারা ফিরে না আসে, তবে সতর্ক ও সংশোধন করার দ্বিতীয় ধাপ হলো—তাদেরকে বিছানায় একা ছেড়ে দাও। অর্থাৎ, তাদের কাছে শোয়া ছেড়ে দাও। সম্ভবত তারা তোমাদের এ অগ্রাহ্যকরণে প্রভাবিত হয়ে আপন অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসবে। যদি শয্যা থেকে তোমাদের আলাদা হওয়ার পরও তারা প্রভাবিত না হয়, তবে সর্বশেষ ধাপ

[১] আবু দাউদ, হাদিস, ২৪৪৪
[২] সূরা নিসা, আয়াত, ৩৫

হলো—তোমরা তাদেরকে মৃদু প্রহার করো। এর মাধ্যমে তাদের সংশোধন করো।

হাদিসে আছে, স্ত্রীর মুখে প্রহার করো না। এমনভাবে প্রহার করো না যাতে জোড়ে আঘাত লাগে এবং হাড় ভেঙে যায়। কোনো কোনো তাফসিরে আছে, মিসওয়াক বা তার মতন কোনো বস্তু দ্বারা প্রহার করা। তবে চেহারায় না মারা। এমনভাবেও না মারা যাতে শরীরে দাগ পড়ে যায়। ইমাম শাফেয়ি রাহি. বলেন, ‹প্রহার করা জায়েজ, তবে প্রহার না করা উত্তম।›

হাকিম ইবনে মুআবিয়া রাহি. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তার বাবা বলেন, আমি বললাম, ‹ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের কারো ওপর তার স্ত্রীর কী হক রয়েছে?› নবিজি বললেন, 'তুমি যখন খাও, তাকেও খেতে দাও; তুমি যখন কাপড় পরো, তাকেও পরতে দাও। তার চেহারায় আঘাত করো না, তাকে গালমন্দ করো না, যদি তার থেকে আলাদা থাকতে চাও, বিছানা আলাদা করো কিন্তু ঘর ছেড়ে যেও না।'[১]

যদি স্ত্রীরা তোমাদের সদুপদেশ কিংবা শয্যাত্যাগ অথবা শাসনের পর তোমাদের আজ্ঞাবহ হয়ে যায় এবং নিজেদের দুর্ব্যবহার ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসে—তবে তোমরা তাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য অভিযোগের পথ তালাশ করো না। তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ এনে তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার মতলব এঁটো না। তাদেরকে দুর্বল ভেবে তাদের ওপর কোনো বাড়াবাড়ি করো না।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি জালিম স্বামীদের থেকে মজলুম স্ত্রীদের বদলা নিতে সক্ষম। নিজ স্ত্রীদের ওপর তোমাদের সেই ক্ষমতা নেই যা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার সমগ্র জগতের ওপর রয়েছে। তাই যখন সেই সর্বশক্তিমান সত্তা আপন উচ্চ মর্যাদা ও মহাশ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও তোমাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করেন তখন তোমরাও নিজ স্ত্রীদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করো। ভালোভাবে জেনে রেখো, তোমরা অধীনদের ওপর যতটুকু ক্ষমতা রাখো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর তার চেয়েও বহুগুণ বেশি ক্ষমতা রাখেন।

হে মুসলিমরা, যদি তোমরা জানো, স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিরোধ রয়েছে এবং এমন কঠিন দ্বন্দ্ব রয়েছে যা তারা আপসে নিষ্পত্তি করতে পারবে না এবং দোষ কার তাও জানা যায় না; সম্পর্কে দিন দিন তিক্ততা বেড়েই চলছে। তবে সেই বিরোধ-

[১] আবু দাউদ, হাদিস, ২১৪২

নিষ্পত্তির পন্থা হলো—বিরোধ-মীমাংসার যোগ্যতা আছে এবং সজ্জন ব্যক্তিত্ব স্বামী ও স্ত্রীর পরিবার হতে একজন একজন করে দুজন সালিশ নিযুক্ত করো।

স্বামী ও স্ত্রীর স্বজনদের মধ্য হতে মধ্যস্থকারী নিযুক্ত করার শর্তারোপ করা হয়েছে। কারণ, পারিবারিক বিষয়সমূহ অনাত্মীয়দের অপেক্ষা আত্মীয়দেরই বেশি জানা থাকে। তদুপরি আত্মীয়রা মীমাংসা করার জন্য অনাত্মীয়দের অপেক্ষা বেশি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে। যদি উভয় মধ্যস্থতাকারী স্বামী-স্ত্রীর পরিবারভুক্ত না হয়, অনাত্মীয় হয়, তবে তাও জায়েজ। দুজন মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করার সুবিধা হলো, পুরুষদের মধ্যস্থতাকারী পুরুষ থেকে এবং স্ত্রীর মধ্যস্থতাকারী স্ত্রী থেকে একান্ত তাদের মনের কথা জেনে নিবে—তারা বিবাহ অটুট রাখতে আগ্রহী না কি বিবাহ বিচ্ছেদে আগ্রহী।

যদি এই দুই মধ্যস্থতাকারী প্রকৃতই আপস-নিষ্পত্তির ইচ্ছা করে এবং নিজ নিজ পক্ষের পক্ষপাতিত্ব না করে, বাস্তব অবস্থা অবগত হওয়ার পর যার যতটুকু ত্রুটি দেখে সে অনুযায়ী তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করে— তবে আশা করা যায়, আল্লাহ তায়ালা তাদের দুজনের মাঝে অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীতে ঐক্য দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যস্থতাকারীরা কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং তাদের নিয়ত কী, আল্লাহ তায়ালা তা ভালোই জানেন।

যদিও নারী-পুরুষের অধিকার সমান; কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা নারীরা দুর্বল হওয়ায় এবং জোর খাটিয়ে স্বামী থেকে নিজেদের অধিকার আদায়ে অসমর্থ হওয়ায়, নারীদের অধিকার প্রদানের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে এ সমতার অর্থ এটা নয়, পুরুষ ও নারীর মাঝে কোনো স্তরভেদ বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং, হিকমত ও ইনসাফের দাবি অনুসারে পুরুষদেরকে নারীদের কর্তা বানানো হয়েছে।

ব্যভিচারী নারী-পুরুষের বিবাহ

ব্যভিচার একটি জঘন্য ও অতি গর্হিত কাজ। এতে মানুষের স্বভাব নোংরা হয়ে যায়। পরিণতিতে নোংরা জিনিসই ব্যভিচারীর হৃদয়গ্রাহী হয়। মুমিনদের জন্য ব্যভিচারী বা পৌত্তলিক নারীদের বিয়ে করা হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝٣

> ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী নারী বা মুশরিক নারীকে বিয়ে করবে। আর ব্যভিচারী নারীকে বিয়ে করবে কেবল ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষ। ঈমানদারদের জন্য এটা হারাম করা হয়েছে।[১]

ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। তার মধ্যে ভালো-মন্দের পার্থক্য লোভ পেয়ে দুশ্চরিত্রতাই কাম্য হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ থাকে না। এমন চরিত্র ভ্রষ্ট লোক ব্যভিচার বা ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যেই কোনো নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারগ অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয়। অথচ সে মনেপ্রাণে বিবাহকে অপছন্দ করে। কেননা, বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিত্র জীবনযাপন করা এবং সৎকর্মপরায়ণ সন্তানসন্ততি জন্ম দেওয়া। এর জন্য স্ত্রীর আজীবন ভরণপোষণের দায়িত্ব ও অন্যান্য অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্র ভ্রষ্ট লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ এ ধরনের লোকের উদ্দেশ্যে থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ শুধু মুসলমান নারীদের প্রতি

[১] সূরা নূর, আয়াত, ৩

নয়, বরং মুশরিক নারীদের প্রতিও থাকে। এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত এবং তাওবা করে না, তার প্রতি কোনো সত্যিকার মুমিনের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ, মুমিনের আসল উদ্দেশ্য হলো—বিবাহ এবং বিবাহের শরিয়তসম্মত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন। এমন নারী দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জন আশা করা যায় না; বিশেষত যখন এ কথাও জানা থাকে, এই নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদভ্যাস ত্যাগ করবে না। হ্যাঁ, এমন নারীকে তেমন কোনো ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা; বিবাহ উদ্দেশ্য নয়।

যে পুরুষের কাছে ব্যভিচার ও শিরক ঘৃণিত নয়; ব্যভিচার এতটাই বাজে স্বভাব যে কারণে ব্যভিচার ও শিরকের প্রতি তার ঘৃণা থাকে না। তাই ব্যভিচারী এবং পৌত্তলিক নারীদেরকে বিয়ে করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একজন মুমিন কীভাবে এ বিষয়টি মেনে নিতে পারে—সে জেনেশুনে বিয়ে করবে একজন ব্যভিচারী কিংবা পৌত্তলিক নারীকে, যে নিজে অপকর্ম ও পৌত্তলিকতায় জড়িত? যে নারী অপকর্মে লিপ্ত এবং তা থেকে ফিরে আসছে না, তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা মানে হলো, এই ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ এ বিষয়ে সম্মত—তার স্ত্রী অপকর্মে জড়িত থাকুক। এ বিষয়ে স্ত্রীকে কিছুই না বলে যে স্বামী নির্বিকার থাকে—এমন বোধহীনতার বৈধতা ইসলামে নেই।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বিয়ে হালাল হওয়ার এ শর্ত বাতলে দিয়েছেন—সেই নারীকে চরিত্রবান হতে হবে; নষ্টা, ব্যভিচারিণী বা গোপন প্রণয়ণী হতে পারবে না। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

> (উল্লিখিত নারীরা ছাড়া) অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো—অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়।[১]

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

> তারা হবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারীও নয়।[২]

এ প্রসঙ্গে ইমাম নাসাফি রাহি. বলেন, এ আয়াতের সবচেয়ে সঠিক তাফসির

[১] সূরা নিসা, আয়াত, ২৪
[২] সূরা নিসা, আয়াত, ২৫; সূরা মায়েদা, আয়াত, ৫

হলো, আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যভিচারী নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা। অর্থাৎ, মুমিন-মুসলমানদের রীতি হলো, তারা মুসলমান পবিত্র রমণী ছাড়া অন্য নারীকে বিয়ে করতে আগ্রহী, যে তার মতো অপকর্মে লিপ্ত কিংবা সে এমন নারীর প্রতি আকৃষ্ট, যার আদতে ঈমানই নেই। এখানে তার তো চরিত্রের কোনো বালাই নেই। ব্যভিচারী নারীর অবস্থাও তেমন, দুই ব্যক্তি তার পছন্দ; একজন ব্যভিচারী পুরুষ। আরেকজন কাফের বা পৌত্তলিক পুরুষ, যে ব্যভিচারীর চেয়ে নিকৃষ্ট; চরিত্র দূরের কথা, তার তো হারাম-হালালেরই তোয়াক্কা নেই।[১]

---

[১] তাফসিরে বাইয়াবির পাদটীকা; শাইখ মাদাহ, ৩/৪১৪

মুনাফিক নর-নারীর কর্ম ও চরিত্রগত মিলকথা

সকল মুনাফিক পুরুষ ও নারী, নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডে একে-অন্যের সাদৃশ্যপূর্ণ। সবাই ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। নারী-পুরুষ সবার একই রকম স্বভাব। যেসব খারাপ অভ্যাস ও চরিত্র পুরুষদের মধ্যে রয়েছে, সেগুলোই আবার নারীদের মধ্যেও রয়েছে। পুরুষ যেমন দুরাচার, নারীও তেমনি। সবার অন্তর অভিন্ন দোষে দূষিত। তারপর সেসব মুনাফিককে সতর্ক করার জন্য আগেকার উম্মতদেরকে কাফেরদের অবস্থা স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে—দেখো, ধনসম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে তারা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। যখন তারা আমার বিধানের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য দেখাল এবং আমার রাসুলকে মিথ্যাবাদী বলল, তখন তাদের কী পরিণতি হয়েছিল, তা কিন্তু তোমরা জানো না। আদ জাতি, সামুদ জাতি এবং তাদের লোকালয়কে যখন উলটিয়ে দেওয়া হলো, তাদের ঔদ্ধত্য ও নাফরমানির জন্য কী পরিণতি হয়েছিল—এ নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করো, শিক্ষাগ্রহণ করো। তাহলে আল্লাহ তায়ালার আযাব-গযবের ব্যাপারে তোমরা এমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছো কেন? আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾

মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা, সবার এক চাল; মন্দ বিষয় শেখায়, ভালো থেকে বিরত রাখে এবং নিজেদের মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহকে ভুলে গেছে তারা, ফলে তিনিও ভুলে গেছেন তাদের। নিঃসন্দেহে

| মুনাফিকরাই নাফরমান।[১]

আল্লাহ্ তায়ালা এখানে বলেছেন—মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারী একে-অন্যের অংশ। অর্থাৎ, সবাই সাদৃশ্যপূর্ণ। মুনাফিকির ক্ষেত্রে একে-অন্যের মতো। নারী-পুরুষ সবাই ইসলাম ও মুসলমানের দুশমনি, বৈরিতা ও বিরোধিতায় স্বভাবগত এক। এসব মুনাফিক পুরুষ ও নারীর অবস্থা হলো, তারা একে-অন্যকে মন্দ বিষয়ের নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ, কুফর, শিরক এবং ইসলামের বিরোধিতায় প্ররোচিত করে। তারা যৌক্তিক ও পছন্দনীয় কাজ থেকে বারণ করে। অর্থাৎ, ঈমান, ইসলাম এবং রাসুলের অনুসরণ থেকে লোকদের বারণ করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে তাদের মুষ্টি বদ্ধ রাখে। অপারগ ও অভাবী লোকদের সাহায্য থেকে তাদের হাত তুলে রাখে।

তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। অর্থাৎ, এ লোকেরা আল্লাহর নির্দেশ ভুলে গেছে, আল্লাহ্ তাদের ওপর থেকে তাঁর অনুগ্রহ সরিয়ে রেখেছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিক লোকেরা—নারী কিংবা পুরুষ, সম্পূর্ণরূপে ফাসেক। এদের প্রত্যেকে গুনাহগার। প্রত্যেক কাফেরই তো ফাসেক; কিন্তু মুনাফিক লোকেরা পাপাচারের ক্ষেত্রে কাফেরের চেয়ে অগ্রসর। এরা যদিও আল্লাহকে ভুলে গেছে; আল্লাহ কিন্তু তাদের প্রতিশোধ ও আযাব-গযবের ব্যাপারে বিস্মৃত ও নীরব নন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ هِىَ حَسْبُهُمْۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

> আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারীদের ও কাফেরদের দোযখের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে তারা পড়ে থাকবে চিরদিন; এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।[২]

---

[১] সূরা তাওবা, আয়াত, ৬৭

[২] সূরা তাওবা, আয়াত, ৬৮

আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন—মুনাফিক এবং কাফের নারী-পুরুষরা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে। তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ, তাদের কুফর ও মুনাফিকির শাস্তির জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। সেখানে তাদের জন্য যথেষ্ট শাস্তি রয়েছে। অধিকন্তু, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি বিশেষ লানত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি, যা কখনো তাদের থেকে পৃথক হবে না।।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا فَٱسْتَمْتَعُوا۟ بِخَلَٰقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ۝٦٩

যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তোমাদের চেয়ে বেশি ছিল শক্তিতে; তারা ধনসম্পদের ও সন্তানসন্ততির অধিকারীও ছিল বেশি। ফলে তারা তাদের অংশ ভোগ করেছে, আর তোমরাও তোমাদের অংশ ভোগ করেছো, যেভাবে তোমাদের আগে যারা ছিল তারা তাদের অংশ ভোগ করেছে। তোমরা খেল-তামাশায় মত্ত হয়েছো, যেভাবে তারা মত্ত হয়েছে। এদের আমলগুলো নিঃশেষিত হয়ে গেছে দুনিয়া ও আখিরাতে। এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।[১]

আল্লাহ যেন এখানে বলছেন— হে মুনাফিকরা, কুফর, মুনাফিকি এবং হকের বিদ্বেষের ব্যাপারে তোমাদের অবস্থা সেই লোকদের মতো, যারা তোমাদের আগে ছিল। তারা যেমন রাসুলের নাফরমানি করে জাহান্নামের বাসিন্দা হয়েছে, তেমনিভাবে তোমরাও রাসুলের নাফরমানি করে জাহান্নামি হলে। আগেকার সেই লোকেরা শারীরিক শক্তি, ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততির ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এভাবে তারা তাদের জাগতিক অংশ তথা ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির দ্বারা উপকৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা পুরোদমে জাগতিক ভোগবিলাস ও আরাম-আয়েশে লিপ্ত ছিল; আখিরাতের তোয়াক্কা করেনি। তাদের পর তোমরাও তোমাদের জাগতিক অংশ থেকে উপকৃত হয়েছো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা দুনিয়া থেকে

[১] সূরা তাওবা, আয়াত, ৬৯

উপকৃত হয়েছিল। তোমরা একেবারে তাদের মতো হলে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে। তোমরাও মন্দ বিষয়াদিতে সেভাবে ঢুকে গেলে, যেভাবে তারা ঢুকে পড়েছিল। অর্থাৎ, তারা যেমন রাসুলদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিল, তেমন তোমরাও করলে। এমন কাফের ও মুনাফিকদের পুণ্যময় কাজে দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো সওয়াব পাওয়া যাবে না। এমন লোকেরাই দুনিয়া-আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। যখন ফসল কাটার সময় এল, তখন গোটা ফসল ধ্বংস হয়ে গেল। এমনটাই এ ধরনের লোকদের অবস্থা। কাজেই তাদের উচিত আগেকার লোকদের অবস্থা ও পরিণতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, শিক্ষা নেওয়া।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَٰهِيمَ وَأَصْحَٰبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

> তাদের কাছে কি তাদের আগেকার লোকদের সংবাদ পৌঁছেনি—নুহের জাতি, আদ, সামুদ, ইবরাহিমের জাতি, মাদায়েনবাসী এবং বিধ্বস্ত নগরীর? তাদের কাছে রাসুলরা স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন। তাই আল্লাহ তাদের ওপর জুলুম করার নন; বরং তারাই তাদের নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল।[১]

আল্লাহ যেন এখানে বলছেন—এই কাফের ও মুনাফিক লোকদের কাছে কি সেই লোকদের সংবাদ পৌঁছেনি যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে; যারা আযাব ও পরিণতি দেখা দেওয়ার আগ পর্যন্ত জাগতিক আরাম-আয়েশে নিমজ্জিত ছিল এবং আখিরাত সম্পর্কে নির্লিপ্ত ছিল? এদের উচিত ওদের অবস্থা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। যেমন, নুহ আ. এর জাতি, যারা প্লাবনে নিমজ্জিত হয়েছিল। আদ জাতি, যারা আঁধি আযাবে ধ্বংস হয়েছিল। সামুদ জাতি, যারা ভূমিকম্পনে ধ্বংস হয়েছিল। ইবরাহিম আ. এর জাতি, যারা নানা প্রকার আযাবে আক্রান্ত হয়েছিল; অভিশপ্ত নমরূদ মাছির দংশনে অক্কা পেয়েছিল। আর আহলে মাদইয়ান, শুআইব আ. এর জাতি সায়াবান দিবসের শাস্তিতে ধ্বংস হয়েছিল। আর উলটে যাওয়া জনপদগুলো অর্থাৎ, লুত আ. এর

[১] সূরা তাওবা, আয়াত, ৭০

জাতির বসতিও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

এদের সবার কাছে তাদের রাসুল ও নবিরা, নিজেদের নবুওয়াত ও রিসালাতের আলোকিত প্রমাণ সম্ভার ও পরিষ্কার নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছিলেন; ইলাহি আযাব থেকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু এই জালিমরা কারো কথা শোনেনি। অবশেষে তারা ধ্বংস হলো। আল্লাহ এমন নন—তাদের প্রতি জুলুম করবেন এবং বিনা অপরাধে তাদের প্রতি আযাব নাযিল করবেন। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করত। আল্লাহ তায়ালা এসব জাতির প্রতি জুলুম করেননি, তাদের প্রতি শাস্তি দিতে গিয়ে তাড়াতাড়ি করেননি; বরং নবি-রাসুল পাঠিয়ে তাদের অজুহাতের পথ বন্ধ করেছেন এবং তাদের ওপর প্রমাণের পূর্ণতা সাধন করেছেন। কিন্তু তারা কোনোভাবেই যখন আল্লাহর প্রেরিত নবি-রাসুলের প্রতি মিথ্যারোপ এবং তাদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ থেকে বিরত হলো না, তখনই আল্লাহ আযাব নাযিল করলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন—আমি তাদের ওপর কোনো জুলুম করিনি; খোদ তারাই ঔদ্ধত্য ও নাফরমানি করে তাদের প্রাণের ওপর জুলুম করেছে। কাজেই এ কালের কাফের ও মুনাফিকদেরও তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত— নবি-রাসুলদের প্রতি মিথ্যারোপ করলে পরিণতি এমনই হয়। তেমনি কিন্তু তোমরাও এমনই কার্যকলাপ করছো, বিধায় তোমরাও তেমন নিকৃষ্ট পরিণতির উপযুক্ত।

নারীবিধি: যা না জানলেই নয়

মাহরাম পুরুষ বলতে বোঝায়—যে সমস্ত পুরুষের সাথে নারীর চিরকালীন বিবাহ হারাম। যেমন—বাবা, বাবার বাবা; এভাবে যতই ওপরে যায়। ছেলে, ছেলের ছেলে; এভাবে যতই নিচে যায়। ভাই এবং তার ছেলেরা, বোনের ছেলেরা, চাচা, মামা, শ্বশুর, স্বামীর অন্য পক্ষের ছেলেরা, দুধ-সম্পর্কের বাবা, ছেলে, ভাই। নিজ মেয়ের জামাই, মায়ের স্বামী।

গায়রে মাহরাম নারীর সাথে নির্জনে মিলিত হওয়া পুরুষের জন্য হারাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> মাহরাম ছাড়া কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে নির্জনে মিলিত না হয়।[১]

মসজিদে গিয়ে নারীর নামাজ আদায় করা বৈধ। কিন্তু ফিতনার আশঙ্কা থাকলে মসজিদে যাওয়া উচিত নয়। আয়িশা রা. বলেন, নারীরা এখন যা করছে নবিজি তা দেখলে হয়তো তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন। যেভাবে বনি ইসরাইলের নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল।[২]

পুরুষ মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করলে যেমন তাকে বহুগুণ সওয়াব দেওয়া হয়; নারী নিজ গৃহে নামাজ আদায় করলে তাকেও অনুরূপ সওয়াব দেওয়া হবে। জনৈক নারী নবিজিকে বললেন, ‹আপনার সাথে আমি নামাজ আদায় করতে ভালোবাসি।› জবাবে নবিজি বললেন, ‘আমি জানি তুমি আমার সাথে নামাজ আদায় করতে ভালোবাসো। কিন্তু তোমার জন্য ছোট্ট ঘরে নামাজ পড়া, বাড়িতে

[১] বুখারি, হাদিস, ৫২৩৩

[২] আবু দাউদ, হাদিস, ৫৬৯

নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। আর বাড়িতে নামাজ পড়া মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। আর মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়া, আমার মসজিদে নববিতে নামাজ পড়ার চাইতে উত্তম।'[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

> নারীদের সর্বোত্তম মসজিদ হচ্ছে তার ঘরের সবচেয়ে নির্জনতম স্থান।[২]

মাহরাম সাথি না পেলে নারীর হজ বা ওমরা করা ফরয নয়। কেননা মাহরাম ছাড়া নারীর সফর বৈধ নয়। এ ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> কোনো নারীই যেন মাহরামকে সঙ্গে না নিয়ে তিন দিনের বেশি সফর না করে।[৩]

নারীর অলংকারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয়। বেগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। সাজসজ্জার স্থান মাথা, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তো ওয়াজিব ছিলই, উপরন্তু গোপন সাজসজ্জা যে কোনোভাবেই প্রকাশ করা হোক, তা-ও জায়েজ নয়। অলংকারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা যার দরুন অলংকার শব্দ করতে থাকে, কিংবা অলংকারের পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে বাজা, অথবা মাটিতে সজোরে পা রাখা, যার ফলে অলংকারের শব্দ হয় এবং তা বেগানা পুরুষের কানে পৌঁছে— এগুলো সবই নাজায়েজ।

নারীর কণ্ঠের বিধান

নারীর কণ্ঠ গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কি না এবং বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়েজ কি না—এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ির গ্রন্থসমূহে নারীর কণ্ঠকে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হানাফিদের বক্তব্যও বিভিন্নরূপ। ইবনু হুমাম নাওয়াযেলের বর্ণনার ভিত্তিতে নারীর কণ্ঠকে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফিদের মতে নারীর আযান মাকরূহ। কিন্তু হাদিস

[১] মুসনাদে আহমাদ, হাদিসটি হাসান; সহিহ তারগিব তারহিব, হা/৩৪০
[২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিসটি হাসান; সহিহ তারগিব তারহিব হা/৩৪১
[৩] বুখারি, হাদিস, ১০৮৬

দ্বারা প্রমাণিত, নবিজির বিবিরা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও পর্দার অন্তরাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য মত হলো— যে স্থানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে সেখানে নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশঙ্কা নেই সেখানে জায়েজ। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যেই তাকওয়া নিহিত।

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া

নারী যদি প্রয়োজনবশত বাইরে যায়, তবে সুগন্ধি লাগিয়ে না যাওয়াও উপরিউক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা সুগন্ধিও গোপন সাজসজ্জা। বেগানা পুরুষের নাকে এই সুগন্ধি পৌঁছা নাজায়েজ। তিরমিজিতে আবু মুসা আশআরি রা. এর হাদিসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারিণী নারীর নিন্দা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরে বের হওয়া

ইমাম জাসসাস বলেন, ‹কুরআনে কারীম অলংকারের আওয়াজকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত, রঙিন কারুকার্যখচিত বোরকা পরে বের হওয়া আরো ভালোভাবে নিষিদ্ধ হবে।›

শোক পালন

মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করা কোনো নারীর জন্য জায়েজ নেই। তবে মৃত ব্যক্তি স্বামী হলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করা ওয়াজিব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> ‹আল্লাহ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাসী নারী তার স্বামী ছাড়া কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হালাল নয়।›

শোক পালনের জন্য নারী নিজের সৌন্দর্য গ্রহণ, জাফরান ইত্যাদির সুগন্ধি লাগানো থেকে বিরত থাকবে। যেকোনো ধরনের গয়না, রঙিন—লাল, হলুদ ইত্যাদি কাপড় পরিধান করবে না। মেহেদি বা মেকআপ কিংবা কালো সুরমা বা সুগন্ধিযুক্ত তেল ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। তবে নখ কাটা, নাভিমূল পরিষ্কার

করা, গোসল করা জায়েজ আছে। পরিধানের জন্য কালো বা এরকম নির্দিষ্ট কোনো রঙের পোশাক নেই। যে ঘরে স্বামী মারা গেছে সেখানেই স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সেই ঘর থেকে বের হওয়া হারাম। কোনো প্রয়োজনে বের হতে চাইলে দিনের বেলা বের হবে।

পর্দা

নারী নিজ ঘর থেকে বের হলে সমস্ত শরীর চাদর বা বোরকা দ্বারা আবৃত করা ওয়াজিব। শরিয়তসম্মত পর্দার শর্তাবলি:

১. নারী তার সমস্ত শরীর ঢেকে রাখবে।

২. পর্দার পোশাকটি যেন নিজেই সৌন্দর্যমণ্ডিত না হয়।

৩. পর্দার কাপড় মোটা হবে, পাতলা নয়।

৪. প্রশস্ত বা ঢিলেঢালা হবে, সংকীর্ণ যেন না হয়।

৫. আতর সুবাস মিশ্রিত হবে না।

৬. কাফের নারীদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না।

৭. পুরুষের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না।

৮. কোনো পোশাক যেন নারীদের মাঝে প্রসিদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য না হয়।

যে কাজগুলো নারীদের জন্য বর্জনীয়:

১. মাথার চুল খোলা রেখে বাহিরে যাওয়া।

২. কটু কথা, গালিগালাজের মাধ্যমে স্বামীকে কষ্ট দেওয়া।

৩. স্বামী থাকার পরও পরপুরুষের সাথে পরকীয়া করা।

৪. অপবিত্র হওয়ার পরও পবিত্রতা অর্জনে অলসতা করা। নামাজ সময়মতো না পড়ে অসময়ে পড়া; নামাজের প্রতি অলসতা ও অমনোযোগী থাকা।

৫. মিথ্যা কথা বলা, গিবত করা, চোগলখোরি করা।

৬. অন্যের সুখ দেখে হিংসা করা। পরোপকার করে খোঁটা দেওয়া।

যে সাজসজ্জাগুলো নারীদের জন্য হারাম

১. নকল চুল লাগানো।

২. ভ্রু-প্লাক করা।

৩. কপালের মাঝে টিপ পরা।

৪. ঝংকৃত বা ঘণ্টাযুক্ত কোনো কিছু পরা।

৫. সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে বের হওয়া।

পর্দার বিধি

নারী যাদের সাথে পর্দা করবে বা করবে না, তারা তিন শ্রেণির লোক;

১. স্বামী, তার সাথে কোনো পর্দা নেই। স্বামী যেভাবে ইচ্ছা স্ত্রীকে দেখতে পারে।

২. নারী এবং মাহরাম পুরুষ। সাধারণত নারীর শরীরের যে অংশ বাইরে থাকে এরা তা দেখতে পারবে। যেমন, মুখমণ্ডল, মাথার চুল, কাধ, হাত, বাহু, পদযুগল ইত্যাদি।

৩. অন্যান্য পুরুষ (পরপুরুষ) একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এরা নারীর শরীরের কোনো অংশ দেখতে পারবে না। যেমন, বিবাহ বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নারীকে দেখা জায়েজ। নারীর সৌন্দর্য তার মুখমণ্ডলেই। তাই মুখমণ্ডল দেখেই বেশিরভাগ মানুষ ফিতনায় জড়িয়ে পড়ে। ফাতিমা বিনতে মুনযের রা. বলেন, ‹আমরা পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলতাম।› আয়িশা রা. বলেন, ‹আমরা ইহরাম অবস্থায় বিদায় হজে নবিজির সাথে ছিলাম। উষ্টারোহী পুরুষরা আমাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করত। তারা আমাদের কাছাকাছি হলে আমরা মাথার ওপরের ওড়নাকে মুখমণ্ডলের ওপর ঝুলিয়ে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার মুখমণ্ডল খুলে দিতাম।›

কোনো পোশাকে যদি প্রাণী বা মানুষের ছবি থাকে তবে তা পরিধান করা হারাম। তেমনি তা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা বা জানালা অথবা দরজার পর্দা হিসেবে ব্যবহার করা কিংবা বিক্রয় করাও হারাম। এটা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কবিরা গুনাহ বলা হয় বড় গুনাহগুলোকে, যা উত্তম তাওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না।

ইদ্দত

ইদ্দত কয়েক প্রকারের হয়;

১. গর্ভবতী নারীর ইদ্দত: গর্ববতী স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হোক বা তার স্বামী মৃত্যুবরণ করুক— গর্ভের সন্তান প্রসব হলেই তার ইদ্দত শেষ।
২. যে নারীর স্বামী মারা গেছে: তার ইদ্দত হচ্ছে চার মাস দশ দিন।
৩. হায়েয অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা: তার ইদ্দত হচ্ছে তিন হায়েয। তৃতীয় হায়েয শেষ হওয়ার পর পবিত্রতা শুরু হলেই তার ইদ্দত শেষ।
৪. পবিত্রাবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা: তার ইদ্দত হচ্ছে তিন মাস। রেজঈ তালাকের ইদ্দত পালনকারিণীর ওপর ওয়াজিব হচ্ছে স্বামীর কাছেই থাকা। এই ইদ্দতকালে স্বামী তার যেকোনো অঙ্গ দেখার ইচ্ছা করলে বা তার সাথে নির্জনে হতে চাইলে তা জায়েজ আছে। হতে পারে এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে আবার ঐক্য সৃষ্টি করে দিবেন।

পরচুলা ব্যবহার করা

শরীরে খোদাই করে অঙ্কন করা নারীর জন্য হারাম। এ দুটি কাজই কবিরা গুনাহের অন্তর্গত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> ‹যে নারী পরচুলা ব্যবহার করে আর যে তা লাগিয়ে দেয় এবং যে নারী শরীরে খোদাই করে অঙ্কন করে আর যে তা করিয়ে দেয়; তাদের সবার ওপর আল্লাহর লানত।›[১]

বিবিধ

নারীর কবর যিয়ারত এবং লাশের সাথে যাওয়া নিষেধ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> ‹অধিক হারে কবর যিয়ারতকারী নারীদের ওপর আল্লাহর লানত।›

উম্মে আতিয়া রা. বলেন, ‹জানাযার লাশের সাথে চলতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হয়নি।›[২]

উত্তরাধিকার সম্পদে নারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে অংশ নির্ধারণ করেছেন

[১] বুখারি, হাদিস, ৫৯৩৩
[২] ইবনে মাজাহ, হাদিস, ১৫৭৪

তা তাকে প্রদান করা ওয়াজিব। তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হারাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারীকে প্রাপ্য মীরাস থেকে বঞ্চিত করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাকে জান্নাতের মীরাস থেকে বঞ্চিত করবেন।[১]

স্বামীর ওপর ওয়াজিব হচ্ছে স্ত্রীর প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা। যা ছাড়া স্ত্রী চলতে পারবে না; যেমন, খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র এবং বাসস্থান প্রভৃতির উত্তমভাবে ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিক প্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করবে।[২]

নারীর স্বামী না থাকলে তার বাবা বা ভাই বা ছেলের ওপর আবশ্যক হচ্ছে তার খরচ বহন করা। নিকটাত্মীয় না থাকলে এলাকার স্থানীয় লোকদের তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা মুস্তাহাব। কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> বিধবা এবং অভাবী-মিসকিনদের প্রয়োজন পূরণে প্রচেষ্টাকারী আল্লাহর পথে মুজাহিদের মতন। অথবা রাতে তাহাজ্জুদ আদায়কারী ও দিনে নফল সিয়াম আদায়কারীর মতন প্রতিদান লাভ করবে।[৩]

তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি বিবাহ না করে, তার শিশুসন্তানের লালনপালন করার হকদার তারই বেশি। আর যতদিন শিশু মায়ের কোলে থাকবে, ততদিন শিশুর ভরণপোষণ চালানো বাবার ওপর ওয়াজিব।

নারীকে প্রথমে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব নয়; বিশেষ করে সে যদি যুবতী হয় বা তাকে সালাম দিলে ফিতনার আশঙ্কা থাকে।

সপ্তাহে একবার প্রতি শুক্রবার নারীর নাভিমূল ও বগল পরিষ্কার করা এবং নখ কাটা মুস্তাহাব। তবে চল্লিশ দিনের বেশি দেরি করা নাজায়েজ।

---

[১] ইবনে মাজাহ, হাদিস ২৭০৩; সনদ দুর্বল
[২] সূরা তালাক, আয়াত, ৭
[৩] বুখারি, হাদিস, ৫৩৫৩

মুখমণ্ডলের চুল ওঠানো হারাম। বিশেষ করে ভ্রুযুগলের চুল উপড়ানো নিষেধ। কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> যে নারী চুল উপড়ানোর কাজ করে এবং যার উপড়ানো হয় উভয়ের ওপর আল্লাহর লানত।

বিনা কারণে স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া হারাম। এ ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> যে নারী কোনো রকম অসুবিধা ছাড়াই স্বামীর কাছে তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম।[১]

ঠিকভাবে স্বামীর আনুগত্য করা নারীর ওপর ওয়াজিব। বিশেষ করে স্ত্রীকে যদি বিছানায় অর্থাৎ, সহবাসের জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন তাতে সাড়া দেওয়া বাধ্যতামূলক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> কোনো ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে, কিন্তু স্ত্রী তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে; পরে স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা সেই স্ত্রীকে অভিশাপ দেয়।[২]

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, 'আমি তোমাকে ফেরত নিলাম' কিংবা তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়, তবেই তাকে ফেরত নেওয়া হয়ে যাবে। ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই।

নারী যদি জানে যে রাস্তায় পরপুরুষ থাকবে, তবে বাইরে যাওয়ার সময় আতর বা সুগন্ধি লাগানো হারাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> প্রত্যেক চোখই যিনাকারী। কোনো নারী সুগন্ধি মেখে মজলিসের পাশ দিয়ে গেলে সে এমন এমন; অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী।[৩]

পরিবার-পরিজনের কেউ কোনো শরিয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা এবং তার জন্য বদদুআ করা

---

[১] আবু দাউদ, হাদিস, ২২২৬
[২] বুখারি, হাদিস, ৩২৩৭
[৩] তিরমিজি, হাদিস, ২৭৮৬

উচিত নয়।

ফিকাহবিদরা বলেন, স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিকে ফরয কাজগুলো এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলি শিক্ষা দেওয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ফরয। এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন যে বলে, হে আমার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি, তোমাদের নামাজ, তোমাদের রোযা, তোমাদের যাকাত, তোমাদের এতিম, তোমাদের মিসকিন, তোমাদের প্রতিবেশী—আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা সবাইকে তোমাদের সাথে জান্নাতে সমবেত করবেন। 'তোমাদের নামাজ, তোমাদের রোযা...' ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য হলো, এগুলোর প্রতি লক্ষ রাখো। এক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখিও না। 'তোমাদের মিসকিন, তোমাদের এতিম...' ইত্যাদি বলার অর্থ হলো, তাদের প্রাপ্য খুশিমনে আদায় করো। জনৈক বুযুর্গ বলেন, 'সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাবে থাকবে, যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে মূর্খ ও উদাসীন হবে।'

জাহান্নামবাসীদের অধিকাংশই নারী। এর মূল কারণ, স্বামীর অবাধ্যতা। যে স্ত্রীর ওপর তার স্বামী সন্তুষ্ট থাকে না, তার ইবাদত কবুল হবে না। যে নারী তার স্বামীর শুকরিয়া আদায় করে না, সে কখনো জান্নাত লাভ করতে পারবে না। স্বামীর সন্তুষ্ট ছাড়া এবং তার না-শোকরী করা স্ত্রী জাহান্নামি। স্বামী কিংবা স্ত্রী যেমনই হোক— উভয়ের উচিত ধৈর্যধারণ করা এবং শুকরিয়া আদায় করা। কেননা স্ত্রী তার স্বামীর প্রাপ্য অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত তার প্রভুর প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে না। এমনকি স্ত্রী শিবিকা বা পালকির মধ্যে থাকা অবস্থায় স্বামী তার সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে চাইলে স্ত্রীর তা প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত। আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> আমি যদি কাউকে কারো জন্য সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।[১]

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

> নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর।

[১] রিয়াদুস সালেহিন, হাদিস, ২৯১; তিরমিজি, হাদিস, ১১৫৯

পুরুষদের। কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

আনাস রা. বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

‹নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রামাদানের সিয়াম পালন করে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে— তখন সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে।›[২]

হাদিসে এমনও এসেছে, স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল সিয়াম পালন করাও জায়েজ নয়। এমনকি স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দেওয়াও জায়েজ নয়।

হুসাইন ইবনু মিহসান বলেন, আমার ফুফু আমার কাছে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। তার বক্তব্য—কোনো এক প্রয়োজনে আমি নবিজির কাছে আসলাম। পরে নবিজি বললেন, ‹হে অমুক মহিলা, তোমার স্বামী আছে?› আমি বললাম, ‹জি আছে।› তিনি বললেন, ‹তুমি তার জন্য কেমন?› আমি বললাম, ‹আমি তার আনুগত্য ও খেদমতে কমতি করি না। তবে আমি তার পক্ষ থেকে কমতি পাই।› এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‹তুমি অপেক্ষা করো, তুমি তার থেকে কোথায়ই-বা যাবে? কেননা সে তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।›[৩]

সমাপ্ত

[১] সূরা বাকারা, আয়াত, ২২৮
[২] মেশকাত, হাদিস, ৩২৫৪
[৩] আদাবুল ফিকহ, ২৮৫

প্রিয় মুসলিম বোন আমার, আপনি সম্মানিত।

ইসলাম আপনাকে দিয়েছে অভাবনীয় সম্মান ও মর্যাদা। কিন্তু বস্তুবাদী ভোগবাদি ও পুঁজিবাদীদের অনৈতিক চটুল প্রচারণায় আপনি আপনার প্রাপ্ত-সম্মান সম্পর্কে অজ্ঞ। আপনার ভারসাম্যপূর্ণ অধিকার আপনার জানা নেই। তাই আপনার মনে নিজ ধর্ম-নীতি নিয়ে অনেক প্রশ্ন, সংশয়।

এই বই আপনাকে অধিকার-সচেতন করে তুলবে। আপনাকে পণ্য হিসেবে নয়; মানুষ ও অর্ধেক মানবজাতি হিসেবে ভাবতে শেখাবে। নিজের ধর্মের প্রতি করে তুলবে আস্থাশীল।

বইটি আপনার উপকারে আসবে এই আমাদের প্রত্যাশা।